সমরেশ মজুমদার

অর্জুন@ বিপবিপ ডট কম

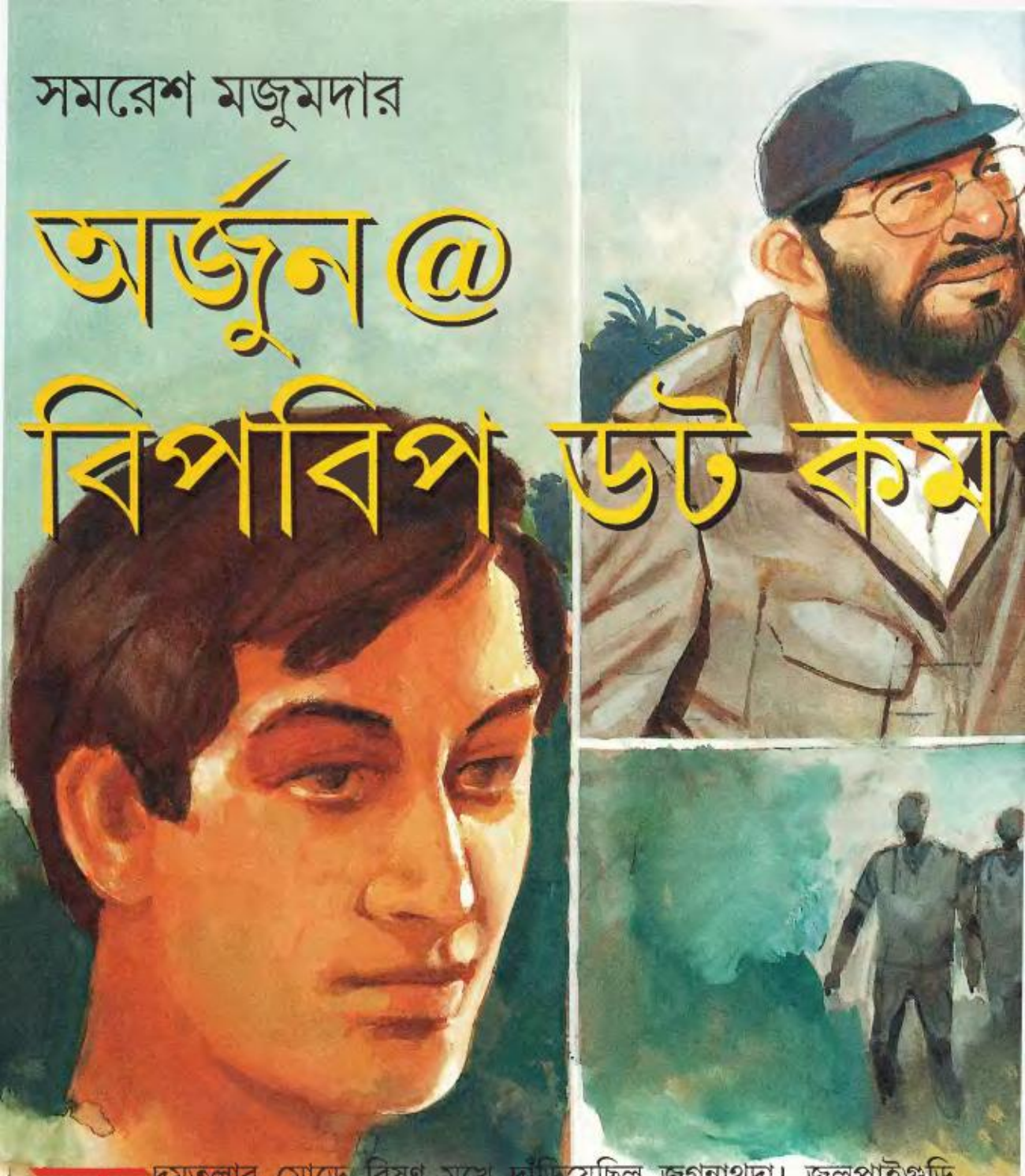

কদমতলার মোড়ে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল জগন্নাথদা। জলপাইগুড়ি শহরের কিছু সৎ মানুষ অনেক চেষ্টা করেও ব্যবসায় সফল হতে পারেননি। না পারার কারণ তাঁদের সততা। এই জগন্নাথদাকে অনেকদিন ধরে চেনে অর্জুন। বাড়ির নীচে বড় রাস্তার উপর তাঁর দোকান। গত দশ বছরে অন্তত তিনবার দোকানের চরিত্র বদলাতে বাধ্য হয়েছেন ব্যবসা

boiRboi.net

সম্পূর্ণ উপন্যাস

Book No
Date

না জমায়। এখন করছেন মোবাইলের ব্যবসা।

প্রথম দিকে বেশ ভিড় দেখেছে অর্জুন জগন্নাথদার দোকানে। ইদানীং লোকজন চোখে পড়ত না। খদ্দের নেই বলেই বোধ হয় জগন্নাথদা দোকানের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন পাশে গিয়ে দাঁড়াল, "কী ব্যাপার? বাইরে দাঁড়িয়ে আছ?"

"ভিতরে বসে কী করব? খদ্দের কোথায়?"

"সেকী! এখন তো প্রায় পঞ্চাশভাগ মানুষের হাতে মোবাইল। তোমার তো ব্যবসা ভাল হওয়া উচিত।" অর্জুন বলল।

"তুমি সত্য অন্বেষণ করে বেড়াও, অথচ কোনও খবর রাখো না। আমার দোকানে এসে মোবাইল কিনলে কাস্টমারকে তার আইডেন্টিটির প্রমাণ দেখাতে হয়। ফর্ম ভর্তি করতে হয়। কোনও মোবাইল কোম্পানির পোস্ট-পেড কানেকশন নিতে হলে নিয়মকানুন মানতে হয়। তা ছাড়া আমি কোম্পানির কাছ থেকে যে দামে সেট নিয়ে আসি, তাতে খুব বেশি কমিশন পাই না। তাতেই এক-একটা সেট চার থেকে পাঁচ হাজারের কমে বিক্রি করা যায় না। অথচ জলপাইগুড়িতে দেড়-দু'হাজারে প্রচুর সেট পাওয়া যাচ্ছে অনায়াসে। কোনও নিয়মকানুন নেই। অতএব লোক আমার কাছ থেকে কিনবে কেন?" শ্বাস ফেললেন জগন্নাথদা।

"এত সস্তায় সেট কী করে পাচ্ছে?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"বিদেশ থেকে স্মাগলাররা নিয়ে আসছে। এখন ক্যামেরা লাগানো

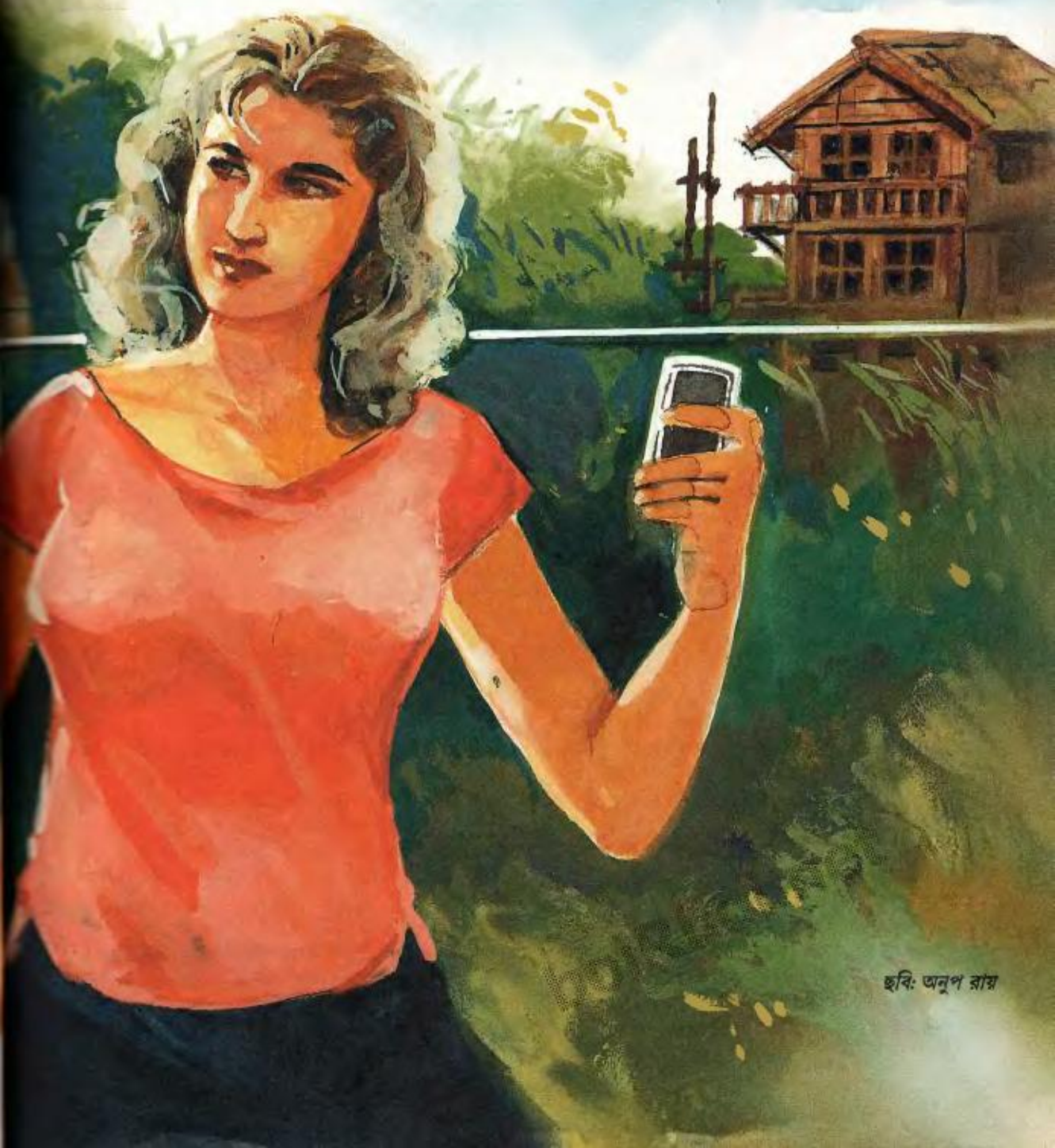

ছবি: অনুপ রায়

মোবাইল সেট ছ' হাজারে কেনা যাচ্ছে।" জগন্নাথদা বললেন।

"কিন্তু সেগুলো খারাপ হয়ে গেলে?"

"সাধারণত দু'-তিন বছরের মধ্যে খারাপ হয় না। কি-প্যাড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চল্লিশ টাকা খরচ করলে নতুন প্যাড লাগিয়ে নেওয়া যায়!"

"পুলিশ কিছু বলছে না?"

"জানি না ভাই। দেখবে সবাই প্রি-পেড কার্ড ব্যবহার করে। ফলে কোনও অপরাধীকেই মোবাইলের সূত্র ধরে ধরা যাবে না।"

"কাছাকাছি কাউকে পাওয়া যাবে, যে চোরাই সেট বিক্রি করে?"

"রূপমায়া সিনেমায় যারা টিকিট ব্ল্যাক করে, তাদের কাছে গিয়ে খোঁজ করো, পেয়ে যাবে।" জগন্নাথদা বললেন।

এখন বিকেল। রূপমায়াতে শাহরুখের ছবি চলছে। হাউসফুল। ম্যাটিনি ভেঙেছে একটু আগে। অর্জুন হলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ ভিড়। কানে এল গুনগুনানি, "কুড়ি পঞ্চাশ, কুড়ি পঞ্চাশ।" সঙ্গে-সঙ্গে একজন ছেলেটার কাছ থেকে চারটে টিকিট কিনে নিল। এই সময় অর্জুনের সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল টাকমাথা একটা লোক, "দাদা আপনি? সিনেমা দেখবেন?"

লোকটাকে কয়েকবার দেখেছে বলে মনে হল অর্জুনের। সে কিছু বলার আগেই লোকটা বলল, "বাম্পার হিট। হাউসফুল চলছে। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে দামে-দামেই টিকিট দিতে বলে দিচ্ছি ওদের।"

"কেন?"

"কী যে বলেন! আপনাকে কে না চেনে? আপনার একটা ফোনে এস পি সাহেব চলে আসবেন দশ মিনিটের মধ্যে! জানি না নাকি?" লোকটা হাসল।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "রাস্তা থেকে ফোন করব যে, ফোন কোথায়?"

"কেন? আপনার মোবাইল নেই?" টাকমাথা লোকটা খুব অবাক হল।

টাকমাথা একটু ভাবল, "আপনি কাল সকালে বাড়িতে থাকবেন?"

"কেন?"

"যে মোবাইল বিক্রি করে, তাকে বলব, বেশ কয়েকটা সেট নিয়ে যেতে। আপনি পছন্দ করে নেবেন। দামের জন্যে ভাববেন না, বাজার থেকে অনেক কমে পাবেন।"

"আমার বাড়ি কোথায় জানা আছে?"

"কী যে বলেন দাদা! এখন বলুন, সিনেমার ক'টা টিকিট লাগবে?"

"না, না। আমি এক বন্ধুকে খুঁজতে এসেছিলাম। সিনেমা দেখতে নয়।"

ঠিক সকাল ন'টায় টাকমাথা লোকটা বেঁটে মোটা মানুষকে নিয়ে এল। লোকটার হাতে একটা অ্যাটাচি। সেটা খুলতেই অর্জুন নানা মডেলের মোবাইল সেট দেখতে পেল। লোকটি বলল, "এগুলো উইথ ক্যামেরা এবং রেডিও। কানে এই নবটা ঢুকিয়ে রাখলে আপনাকে আর সেট হাতে ধরে রাখতে হবে না। গাড়ি বা বাইক চালাতে-চালাতে আরামসে কথা বলতে বা শুনতে পারবেন। এগুলোয় রেডিও নেই, শুধুই ক্যামেরা। আর এগুলো অর্ডিনারি সেল, কিন্তু তিন বছরের মধ্যে ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হবে না।"

"এগুলো ব্যবহার করা সেট নয়তো?"

"কী বলছেন স্যার! একেবারে অরিজিন্যাল নিউ সেট আসছে বাইরে থেকে। এই দেখুন। এই নম্বর টিপলেই দেখতে পাবেন ব্যাটারি কবে তৈরি হয়েছে।"

অর্জুন দেখল। মাত্র তিনমাস আগের ব্যাটারি।

ক্যামেরা-রেডিও সমেত সেটটির দাম জিজ্ঞেস করল অর্জুন। লোকটি হাসল। "আপনার কাছে তো বাড়তি দাম চাইতে পারব না। এদেশে কোম্পানির কাছে থেকে কিনতে আশি হাজারের নীচে পাবেন না।"

"আপনি কততে দিচ্ছেন?" অর্জুন তাকাল।

"আমরা পঁয়ত্রিশে দিয়ে থাকি, আপনি না হয় ত্রিশ দিন।"

"ওরে বাবা!" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"এর নীচে দেওয়া যায় না স্যার। কত হাত ঘুরে আসছে বলুন।"

"কত হাত?"

"শুনেছি বিদেশি জাহাজ থেকে ঝেড়ে মায়নামারে নামানো হয় পেটি। তারপর সেই পেটিগুলো খুলে-খুলে বিভিন্ন জায়গায় চালান করা হয়। ইন্ডিয়ায় ঢোকে ভুটান হয়ে। অন্তত ছ'বার হাতবদল হয়।" লোকটি গর্বের সঙ্গে বলল।

"আপনি পেয়েছেন কার হাত থেকে?"

"আমি শিলিগুড়ির একজন ব্যবসায়ীর সেল-এজেন্ট।"

"কী নাম?"

"মাফ করবেন স্যার। নাম বলতে পারব না। নিষেধ আছে।" এবার যে লোকটি সতর্ক হয়েছে, তা তার মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

"তিনি ভুটান থেকে নিয়ে আসেন?"

"ওই আরকী! আপনি যদি নেন, তা হলে ত্রিশে দিয়ে দিতে পারি।"

"যদি পুলিশ আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় পেলে?"

"সেই ব্যবস্থাও আছে। তার জন্য মাত্র দু'হাজার বেশি দিতে হবে।"

"কী রকম?"

"বলবেন, থিম্পু থেকে কিনেছি। থিম্পুর একটা দোকানের রসিদ দিয়ে দেব আপনাকে। অরিজিন্যাল রসিদ। লিগাল পেপার। ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে যেতে ভারতীয়দের ভিসা করতে হয় না, পাসপোর্টের প্রয়োজন নেই। পুলিশ বিশ্বাস করতে বাধ্য। কারণ দোকানটা আছে কিনা, সেই খোঁজ করতে থিম্পু যাওয়া ভারতীয় পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। দু'টো দেশ তো আলাদা।"

"ভুটান-পুলিশকে অনুরোধ করতে পারে তদন্ত করে দেখার জন্য।"

"আপনি কী ভেবেছেন এরকম ঘটনা আগে ঘটেনি? ভুটানের পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে ওই নামের দোকান থিম্পুতে আছে এবং তারা আইনসঙ্গতভাবে সেট বিক্রি করে।"

অর্জুন তাকাল, "কিন্তু আপনারা বেআইনি কাজ করছেন এবং এই অন্যায় করার জন্য, যারা আইন মেনে ব্যবসা করতে চান তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি।"

"নিশ্চয়ই পারেন। আমাকে পুলিশে দিলে যদি এই মোবাইল ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে দিতে পারেন। আমি আপত্তি করব না।"

অর্জুন ভাবল, লোকটা যে গলায় কথা বলছে তাতে কোথাও ওর জোর আছে। হয়তো পুলিশকে বলবে সবক'টার বৈধ কাগজপত্র আছে। তা ছাড়া একজনকে ধরলে তো অন্য স্মাগলারদের ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

লোকটা বলল, "এক কাজ করুন, আপনি পঁচিশ দিন। আমার একটা পয়সা লাভ থাকবে না, উলটে লস-ই হবে। হোক।"

"আপনি যেতে পারেন। মোবাইল কিনতে হলে আমি ভারতীয় মোবাইল এখানকার দোকান থেকে কিনব।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

বিকেলে অর্জুন জলপাইগুড়ি থানার কম্পাউন্ডে বাইক থেকে নামল। থানার ওসি তখন অফিস থেকে বেরোচ্ছিলেন, অর্জুনকে দেখে এগিয়ে এলেন, "কী ব্যাপার, কেমন আছেন? আপনার তো সমস্যা না হলে আমাদের কথা মনে পড়ে না।"

"একেবারে সত্যি কথা। সমস্যায় না পড়লে এখানে আসা মানে

আপনাদের সময় নষ্ট করা। কোনও জরুরি কাজে বেরোচ্ছেন?"

"না, না। গত তিনদিন আমার থানায় কেউ একটা ডায়েরি করতে আসেনি। এটা একটা রেকর্ড। তাই ভাবলাম শহরটাকে একবার ঘুরে দেখে আসি।" ওসি বললেন।

"তা হলে চলুন, আমি একটা কমপ্লেন নথিভুক্ত করতে চাই।"

"কীরকম?"

"এই শহরে স্মাগল্‌ড মোবাইল সেট এত কম দামে বিক্রি হচ্ছে যে, সৎ দোকানদারদের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলার উপক্রম হয়েছে। এই চোরাকারবারিদের উৎখাত করতে পুলিশ সক্রিয় হোক।"

ওসি জিজ্ঞেস করলেন, "পাবলিককে ঠেকাবেন কী করে?"

"তার মানে?"

"ছ' হাজারের জিনিস যদি দু'হাজারে পাওয়া যায়, তা হলে পাবলিক হাজার নিষেধ সত্ত্বেও কিনবে। লুকিয়ে কিনে ব্যবহার করবে," ওসি বললেন, "আমার পক্ষে তো সবাইকে হাতেনাতে ধরা সম্ভব নয়।"

"ঠিক। কিন্তু যে বা যারা ওগুলো বিদেশ থেকে এনে এজেন্ট মারফত বিক্রি করছে, তাদের খুঁজে বের করা তো সম্ভব।" অর্জুন বলল।

"আমরা চেষ্টা করছি। এর আগে কয়েকটা সেট সিজ় করলেও ছেড়ে দিতে হয়েছে। কারণ, ওরা থিম্পু কিংবা পারোর দোকানের রসিদ দেখিয়েছে। আপনার কাছে যদি কোনও সূত্র থাকে, তা হলে আমাদের সাহায্য করুন। কথা দিচ্ছি, অলআউট যাব।"

অর্জুন জগন্নাথদার দোকানে চলে এল। তখন একজন বয়স্ক মানুষ কাউন্টারের এপাশে দাঁড়িয়ে। বাইক থেকে নেমে দোকানে ঢুকতেই জগন্নাথদা একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

"ভাবছি, এবার মোবাইল নেব।"

"বেশ তো! তোমার ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন, যেরকম ঘুরে বেড়াও।"

ভদ্রলোক বললেন, "পঁচিশ বছর আগে এই যন্ত্রের কথা কে জানত!"

"তা ঠিক।" জগন্নাথদা বললেন, "তার ছাড়া কথা বলার ব্যাপার কল্পনাতেই ছিল না।"

"শুনুন একটা ঘটনা। আমার এক আত্মীয়ের বাতিক ছিল টেলিফোনের। যে বাড়িতেই যেত, তাদের ফোন থাকলে বলত, 'একটা কল করতে পারি?' কোনও জরুরি কথা নয়! ডায়াল করে বলত, 'আমি এই বাড়িতে আছি এখন, কিছুক্ষণের মধ্যে বেরোব।' আমরা বুঝতাম এটা ওর অসুখ। ফোন দেখলে স্থির থাকতে পারে না। একদিন আমি ওকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলাম, 'তোমার যা অবস্থা, তাতে রাস্তায় হাঁটার সময়, বাসে চলার সময়ও ফোন থাকলে খুশি হও।' বছরতিনেক আগে সে আমাকে ফোন করে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক হল, আমি বাসের সিটে বসে তোমাকে ফোন করছি।' আমি আর কী বলব? একসময় যা অসম্ভব মনে হত, বিজ্ঞান তাকে কত দ্রুত সম্ভব করে দিয়েছে।"

জগন্নাথদা বললেন, "ঠিক কথা। মোবাইল হাতে ধরে কথা বলতে হয় বলে সে সময় মানুষ অন্য কাজ করতে পারে না। গাড়ি যাঁরা চালান, তাঁরা চলন্ত অবস্থায় ওইভাবে কথা বললে দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। তাই বেরিয়ে গেল রিমোট সিস্টেম। সরু তারের হেডফোন কানে গুঁজে, পকেটে মোবাইল সেট রেখে, দিব্যি দু হাত মুক্ত রেখে সব কাজ করতে-করতে কথা বলা সম্ভব হয়ে গিয়েছে।"

ভদ্রলোক হাসলেন, "ভাবো না, কিছুদিনের মধ্যে মোবাইল সেট-ই উঠে যেতে পারে। আপনাকে দোকান বন্ধ করতে হতে পারে।"

"সে তো এখনই করব ভাবছি। চোরাই ব্যবসার সঙ্গে পেরে উঠব কী করে?" জগন্নাথদা মাথা নাড়লেন, "কিন্তু কেন বললেন কথাটা?"

"সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন হ্যান্ডসেটের কোনও

প্রয়োজন হবে না। যার সঙ্গে কথা বলব তার মস্তিষ্কের সেল নেটওয়ার্কে ধরে কথা বললেই সে হয়তো শুনতে পাবে। কিছুই বলা যায় না।" প্রি-পেড ক্যাশকার্ড কিনে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

জগন্নাথদা বললেন, "খুব খুশি হব। আমার দোকান না হয় বন্ধ হবে, কিন্তু স্মাগলাররা তো বিপদে পড়বে। ও হ্যাঁ, কী ধরনের সেট নেবে?"

"সবচেয়ে কম দামের কী আছে?"

"তিন হাজার চারশোতে পেয়ে যাবে।"

"ঠিকঠাক কাজ করবে তো?"

"কথা বলা-শোনায় অসুবিধে হবে না। তবে দাম কম বলে শক্তিও কম। তুমি পাঁচ হাজারের এই সেটটা নাও। এর সম্পর্কে কোনও কমপ্লেন নেই।"

"ঠিক আছে। আমাকে কী করতে হবে?"

"নিয়ম হল, তোমার পরিচয়পত্র আর ফোটো দিয়ে এই ফর্মটা ভর্তি করতে হবে। এখনই পোস্ট-পেডে যেও না। প্রি-পেড ক্যাশকার্ড কিনে দ্যাখো কীরকম খরচ হচ্ছে।" জগন্নাথদা ফর্ম বের করে প্রশ্ন করে-করে সেটা ভর্তি করলেন। ঠিক হল, অর্জুন আগামীকাল এসে ফোটো এবং প্রমাণপত্র দিয়ে যাবে। জগন্নাথদা চেক নিতে রাজি হলেন। অর্জুন বাড়ি ফিরে এল। মা বললেন, "ইস, একটু আগে এলে তুই মেজরের সঙ্গে কথা বলতে পারতিস।"

"আচ্ছা! মেজর ফোন করেছিলেন?" অর্জুন সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। বললেন কয়েকদিনের মধ্যে উনি এদিকে আসছেন। দিল্লি হয়ে সোজা বাগডোগরায় নামবেন। বললেন, দিল্লিতে নেমে তোকে ফোন করবেন।"

খুশি হল অর্জুন। মেজর আসা মানে দিনগুলো অন্যরকম হয়ে যাওয়া। ভদ্রলোক যে কেন এই বয়সে আমেরিকায় একা রয়েছেন, তা বুঝতে পারে না সে। এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ভেবে জিজ্ঞেসও করেনি।

এই সময় হাবু এল। হাবুকে দেখলেই অমল সোমের কথা মনে পড়ে যায়। অমলদা জলপাইগুড়ি ছেড়েছেন অনেকদিন, কিন্তু বাড়ি বিক্রি করেননি। হাবু সেই বাড়িটিকে বেশ যত্নে রেখেছে। বছরে দু'বার হাবুর নামে টাকা পাঠান অমল সোম। তাতে দিব্যি চলে যায় তার। সেই টাকায় ইলেকট্রিক, ট্যাক্স, টেলিফোনের ভাড়া মিটিয়ে হাবুর খাওয়া-পরায় কোনও অসুবিধে হয় না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

হাবু হাসল। বেচারা কথা বলতে পারে না। তারপর পকেট থেকে একটা খাম বের করে সামনে ধরল। উপরে অর্জুনের নাম, কেয়ার অফ অমল সোম লেখা। একটু অবাক হল সে। অমলদা তার ঠিকানা জানা সত্ত্বেও নিজের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পাঠালেন কেন? চিঠি বের করে চোখ রাখল অর্জুন,

"স্নেহের অর্জুন, আশা করি ভাল আছ। শ্রীমান হাবু যাতে একটু নড়াচড়া করে তাই আমার ঠিকানায় চিঠিটি পাঠাচ্ছি। মাঝে-মাঝে ও মাথার ব্যথায় কষ্ট পেত। ওর কথা বলতে না পারার কারণ কণ্ঠনালী, জিভ অথবা মস্তিষ্কের ঘাটতির কোনটা জানি না। তুমি ওর ব্রেন স্ক্যান এবং পি ই টি করিয়ে রিপোর্টটা পাঠাতে পারবে? এই একটা ব্যাপার, আমরা শরীর সুস্থ রাখতে পরীক্ষা করাই, কিন্তু ব্রেন সম্পর্কে বড় উদাসীন। তুমিও নিশ্চয়ই কখনও তোমার ব্রেন স্ক্যান করাওনি। তুমিও তোমার ব্রেনের স্ক্যানিং এবং পি ই টি রিপোর্ট পাঠাবে। এটা জরুরি। দু'টো রিপোর্টই আমাকে মেলে পাঠাবে। আমার অ্যাড্রেস হল, সোম এ ডট নেট ডট কম।

তোমাদের অমলদা।

পুনশ্চ: তোমার মোবাইল নম্বর কী অবশ্যই জানাবে।"

হাবুর দিকে তাকাল অর্জুন। মুখে হাসি যেন সেঁটে আছে।

"সব ঠিক আছে তো?"

মাথা নাড়ল হাবু। মাথায় হাত দিয়ে বোঝাল সেখানে ব্যথা হয়।

"কাল সকাল আটটায় এখানে চলে এসো।"

মাথা নেড়ে হাবু চলে গেল। হাবুর না হয় মাথায় ব্যথা হয়, তার তো কোনও সমস্যা নেই। তা হলে খামোখা স্ক্যান করাতে যাবে কেন? অমলদার যে বয়স বাড়ছে, এতে বোঝা যাচ্ছে। মাকে চিঠির কথা বলতেই উলটো কথা শুনল অর্জুন, "দ্যাখ, উনি এখন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন। ওঁর কথা ফেলিস না, যা বলেছেন তাই কর।"

"তার মানে তুমি বলতে চাও অমলদা যোগবলে জানতে পেরেছেন আমার মাথার ভিতরে কিছু হয়েছে, যেটা আমিই জানি না। কপাল!"

মা গম্ভীর হলেন, "গুরুর আদেশ সব সময় শিরোধার্য করতে হয়। উনি যা করতে বলেছেন তাই কর বাবা।"

টেলিফোনে অর্জুন কথা বলে রেখেছিল ক্লিনিকের ডাক্তারের সঙ্গে। হাবুকে নিয়ে সোয়া আটটার সময় সেখানে হাজির হয়ে সমস্যায় পড়ল অর্জুন। তার কাছে কোনও প্রেসক্রিপশন নেই। ওটা না থাকলে ঠিক কী রিপোর্ট চাইছে, তা স্পষ্ট হচ্ছে না। অর্জুন অমল সোমের চিঠি দেখাল। হাবুর ব্যাপারটা ওঁরা বুঝতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "যিনি চিঠি লিখেছেন তিনি কি ডাক্তার?"

"না। তিনি একসময় সত্যসন্ধানী ছিলেন।"

"তা হলে কোনও ডাক্তারকে দিয়ে প্রেসক্রিপশন করিয়ে আনুন, প্লিজ।"

কাছেই চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্স। তার মালিক রামদার বয়স বেড়ে যাওয়ায় শুধু সকালের দিকটায় দোকানে আসেন। এখন ওঁর ছেলেই দোকান চালায়। হাবুকে নিয়ে সেখানে গেলে রামদাকে দেখতে পেল অর্জুন। মাথার চুল এখন ধবধবে সাদা হয়ে গেলেও হাসিটি অবিকল আছে। বললেন, "কী খবর? ভাল তো?"

"ভাল ছিলাম। কিন্তু অমলদা বিপাকে ফেলেছেন। পড়ে দেখুন।"

চিঠিটা পড়লেন রামদা। হাবুকে দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কি প্রেসক্রিপশন চাইছে?"

"হ্যাঁ।"

পাশে বসা ভদ্রলোককে রামদা জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুনকে চেনেন?"

"আলাপ নেই, তবে জানি।" ভদ্রলোক বললেন।

"ওর গুরুর ইচ্ছে পূর্ণ করতে একটু সাহায্য করুন। অর্জুন, ইনি ডক্টর সুধীর রায়। আসা-যাওয়ার পথে আমাকে দোকানে দেখলে একটু গল্প করে যান।

অমলদার চিঠিটা পড়ে দু'জনের জন্য দু'টো আলাদা প্রেসক্রিপশন লিখে নাম জিজ্ঞেস করলেন। হাবুর পদবি অর্জুনের জানা নেই। তাকে জিজ্ঞেস করেও কোনও লাভ হবে না। অতএব লিখতে হল, শ্রী হাবু...। অর্জুন রামদাকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "ওঁর সম্মানদক্ষিণা কত?"

ডক্টর রায় সেটা শুনতে পেয়ে হেসে ফেললেন, "একটা পয়সাও না। রিপোর্টে কোনও গোলমাল থাকলে ওরাই বলে দেবে, তখন আমার চেম্বারে আসবেন।"

রিপোর্ট আজ বিকেলে পাওয়া যাবে। পাঁচ হাজার টাকার সঙ্গে ছবি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে পাসপোর্টের জেরক্স নিয়ে জগন্নাথদার দোকানে চলে এল অর্জুন। সব দেখেশুনে জগন্নাথদা তিনটে তিনরঙের সেট সামনে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনটা পছন্দ, বলো?"

অর্জুন ইস্পাতরঙা সেটটা তুলে নিল।

সব ঠিকঠাক করে জগন্নাথদা বললেন, "এই তোমার নম্বর। একবার এই কার্ডে চোখ বোলালেই তুমি বুঝে যাবে কী করে অপারেট করতে

হবে। তোমার ফোন চালু হতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগবে। দেখবে বাঁদিকে একটা লাইন ফুটে উঠেছে।"

আপাতত নিষ্ক্রিয় মোবাইল পকেটে রেখে বাইক চালিয়ে রিপোর্ট নিতে গেল অর্জুন। রিপোর্ট পেয়ে শুনল তার তো বটেই, হাবুর রিপোর্টও নর্মাল। হাবুর না হয় স্ক্যান করানো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু নিজের স্ক্যানের পিছনে দেওয়া টাকাটার জন্য এখন আপশোস হতে লাগল অর্জুনের। অনেক টাকা ফালতু নষ্ট হল।

একটা সাইবার কাফেতে ঢুকল সে। মালিক তার চেনা। ঘণ্টায় কুড়ি টাকা নেয়। তাকে বলল, "এই রিপোর্ট দুটো মেল করতে হবে। কত দেব?"

একবার চোখ বুলিয়ে ছেলেটি বলল, "দশ টাকা দেবেন। আপনি করবেন? তা হলে ওই মেশিনটার সামনে বসুন।"

অর্জুন বসল। নেট খুলল। এই মেশিনগুলোর আয়ু বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে। অনেক দেরিতে কানেকশন পাওয়া গেল। পুরো রিপোর্ট টাইপ করে অমলদার ই-মেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিল অর্জুন। সেই সঙ্গে নতুন মোবাইলের নম্বর।

তারপর দশটা টাকা দিয়ে বাইকে উঠে বসল। হঠাৎ মনে হল, কাছাকাছি কোথাও টেলিফোন বাজছে। প্রথমে সে গুরুত্ব দেয়নি। তারপর বুঝতে পারল, আওয়াজটা আসছে তার পকেট থেকে। দ্রুত সেটটা বের করে সে বোতাম টিপে হ্যালো বলল। সঙ্গে-সঙ্গে জগন্নাথদার গলা শুনতে পেল, "তোমার মোবাইল চালু হয়ে গিয়েছে ভাই।"

তিনদিনের মধ্যে শহরের পরিচিত ব্যক্তিরা অর্জুনের মোবাইল নম্বর জেনে গেল। গলির মুখেই বুড়িদির সঙ্গে দেখা। ক'দিন হল বাপের বাড়িতে এসেছে। বুড়িদি জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে অর্জুন, তুই মোবাইল নিয়েছিস?"

"এটা কোনও ঘটনা?"

"তা না। কিন্তু ভাবতেই পারছি না চোরাকারবারিদের কাছ থেকে কিনেছিস!" বুড়িদি বলল, "দেখি তোর মোবাইলটা।"

অর্জুন দেখাল। বুড়িদি দেখে বলল, "কত দিয়েছিস বল, পনের'শ?"

"এর দাম পনেরোশো বুঝি?"

"হ্যাঁ। আমার দেওর কিনেছে। এই এক মডেল। তোর কাছ থেকে কত নিয়েছে?"

"পাঁচ হাজার।"

"অ্যাঁ! হায়, তোর গলা কেটেছে রে। তুই জানিস না, নর্থ বেঙ্গল এখন টানা মালে ভরে গেছে।"

"আমি জগন্নাথদার দোকানে ফর্ম ভর্তি করে কিনেছি।"

বুড়িদি হাঁ হয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, "তাই বল।"

"তুমি কী করে ভাবলে আমি টানা মাল কিনব!"

"ভাবতে তো পারিনি। কিন্তু যেটা দেড় হাজারে পাওয়া যায় সেটা পাঁচ হাজারে কেউ কিনবে, তাও বিশ্বাস করতে পারিনি। ইস্, আমার মন খুব ছোট হয়ে গিয়েছে রে।"

"দুর! তুমি ঠিকই ভেবেছ। আমি ধরে নিলাম, এ ক্ষেত্রে সততার দাম তিন হাজার টাকা। এদিক দিয়ে ভাবলে মনে হবে খুব সস্তা।"

কদমতলায় চায়ের দোকানের বন্ধুরাও খুব আওয়াজ দিল তার নির্বুদ্ধিতার জন্য। আদর্শের জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা লস করার কোনও মানে হয় না। জগুদা মোবাইল ব্যবহার করেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, "বোকামির দাম সাড়ে তিন হাজার টাকার অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "তার মানে?"

"তুমি দশ হাজারের মোবাইলটা সাড়ে পাঁচে কিনেছ। পুলিশ যদি তোমাকে ধরে তুমি খিম্পুর রসিদ দেখাবে। তাই তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু ওখানে যে তারিখ লেখা আছে, সেই তারিখে তুমি এখানে অফিস করেছ তা প্রমাণ করতে পুলিশের কোনও অসুবিধে হবে না।"

"দুর! অত ঝামেলা পুলিশ করবে না।"

"যদি করে? তা হলে মোবাইলটা বাজেয়াপ্ত হবে। অন্তত দিনসাতেকের জেল হয়ে যেতে পারে। এরকম হলে অফিস তোমাকে সাসপেন্ড করতে পারে। মোবাইল কিনে তুমি যে সাড়ে চার হাজার প্রফিট করেছিলে, তার বহুগুণ লস করবে এরকম হলে।" জগুদা বললেন।

ছেলেটি চুপ করে থাকল। অর্জুন বুঝল, বেচারা খুব চিন্তায় পড়ে গেল।

রাতে যখন শুতে যাচ্ছে তখন ল্যান্ডলাইনের ফোন বাজল। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই মেজরের গলা কানে এল, "এই যে তৃতীয় পাণ্ডব, কেমন আছ?"

"আপনি? আপনি কোত্থেকে?"

"দিল্লিতে। একটু আগে পৌঁছেছি। কাল সকালে বাগডোগরায় ফ্লাইট ধরব। এয়ারপোর্টে আসবে নাকি?"

"অবশ্যই।" অর্জুন হাসিমুখে বলল।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। কাছাকাছি কোথাও রিং হচ্ছে। মোবাইল বাজছে। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে টেবিলে রাখা মোবাইলটা তুলল সে। না, কোনও শব্দ নেই। কেউ কি তাকে মোবাইলে ফোন করেছিল? ধরছে না দেখে লাইন কেটে দিয়েছে? সে বোতাম টিপে কল রেজিস্টারে চলে এল। তারপর মিস্ড কলসে গিয়ে দেখল, কয়েকটা ডট ফুটে উঠেছে। কোনও নম্বর নেই। যে ফোন করে কেটে দিয়েছে, এখানে তার নম্বর ফুটে ওঠার কথা। কয়েকটা ডট কারও নম্বর হতে পারে না। তা হলে? মাথামুন্ডু বুঝতে না পেরে ফোনটা অফ করে শুয়ে পড়ল অর্জুন। যার দরকার, সে কাল সকালে ফোন করবে। সে যাঁদের নম্বর দিয়েছে, তাঁদের কেউ মাঝরাতে রসিকতা করার জন্য ফোন করবেন না। তা হলে...। খচখচানি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঘুম এসে গেল।

প্রতিবারই কোথাও গেলে মা যে ব্যাগটা এগিয়ে দেন, তাতে তিনদিনের পোশাক ইত্যাদি থাকে। আজও সেই ব্যাগ নিয়ে সকালবেলায় কদমতলার মোড়ে এসে অর্জুন দেখল, জগন্নাথদা দোকান খুলছেন। পকেট থেকে মোবাইল বের করে সে জগন্নাথদাকে গত রাতের অভিজ্ঞতার কথা জানাল। ভদ্রলোক হেসে বললেন, "এরকম হওয়া অস্বাভাবিক। বিকেল থেকে ফোন এলেও তিন-চারটে নম্বর ফুটে উঠবে। দাও তো দেখি।" মোবাইল সেট নিয়ে নম্বর টিপে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, "কোনও সমস্যা নেই। সব ঠিক আছে। তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় ভুল শুনেছ।"

"তাই যদি হবে, তা হলে এই ডটগুলো এল কী করে?" অর্জুন মাথা নাড়ল, "যাক গে। আমি এখন বাগডোগরা যাচ্ছি। ওখানে তো নেটওয়ার্ক পাব না, না?"

"পাবে। রোমিং করে নিতে হবে। আগে প্রিপেডে রোমিং হত না। এখন হচ্ছে। তোমার এই কার্ড থেকেই চার্জ কেটে নেবে। অর্থাৎ যতটা কল তুমি করতে পারতে রোমিং-এর কারণে সেটা কমে যাবে।"

"ঠিক আছে। যা করার করে দিন।"

জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি হয়ে যখন অর্জুন বাগডোগরায় পৌঁছোল তখন ভরদুপুর। দিল্লির ফ্লাইট আজ দেরিতে আসছে।

এখনকার এয়ারপোর্টের চেহারা দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে বছরচারেক আগের কথা। তখন একতলার একটা হলঘরে যাত্রীদের ঠাসাঠাসি করে বসে থাকতে হত। আজকের তুলনায় সেটা প্রায় গ্রাম্য ছিল বলাই ঠিক। আধুনিক রেস্টুরেন্টে বসে খাবার অর্ডার দিয়ে চারপাশে তাকাল অর্জুন। আশপাশের টেবিলগুলোয় নারী-পুরুষরা গল্প করছেন। এঁরা হয় নিজেরা উড়বেন অথবা কাউকে নিতে এসেছেন। একেবারে কোনার টেবিলে যিনি একা বসে আছেন, তাঁর চোখে রোদচশমা, গালে একটা হাত, অন্য হাতে ম্যাগাজিন ধরা। দেখলে মনে হবে, মনোযোগ দিয়ে ম্যাগাজিন পড়ছেন। কিন্তু অর্জুনের মনে হল, উনি মূল দরজার দিকে নজর রাখছেন। মুখ ঈষৎ বেঁকে থাকায় ধারণাটা তৈরি হল। ভদ্রলোকের পরনে নীল জ্যাকেট। চেহারা বলে দিচ্ছে, উনি পাহাড়ের মানুষ। নেপালি নন, হয় সিকিম বা ভুটানের মানুষ।

মঙ্গোলিয়ান মানুষের মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা অসম্ভব। খাবার এসে যাওয়ায় সেদিকে মন দিল অর্জুন। তখনই ঘোষণা কানে এল, দিল্লির ফ্লাইট এখনই পৌঁছে যাবে। দ্রুত খাওয়া শেষ করে কাচের দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই প্লেনটা মাটিতে নামতে দেখল সে। কিছুটা ঘোরাঘুরি করে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে এসে থামতেই সিঁড়ি লাগিয়ে দেওয়া হল দরজা খোলার পর। একে-একে যাত্রীরা নামতে লাগলেন। মেজরের শরীরটাকে সে দেখতে পেল সবার শেষে। মেজরের সঙ্গে একজন অল্পবয়সি মহিলা কথা বলতে-বলতে নামলেন। তার পরনে জিন্স আর টপ। মেজরের চেহারা প্রায় একই রয়েছে। কাঁচাপাকা দাড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন মহিলার সঙ্গে।

অর্জুন বেরোবার দরজার সামনে গিয়ে দেখল বেশ ভিড় জমেছে সেখানে। অনেকেই অপেক্ষা করছেন পরিচিতদের রিসিভ করার জন্য। সে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। মিনিটকুড়ি বাদে ট্রলিতে টাউস-টাউস তিনটে সুটকেস চাপিয়ে মেজরের শরীর বেরিয়ে এল ভিড় ফুঁড়ে। তাঁর পিছনের মহিলার ট্রলিতে একটা সুটকেস। ফাঁকায় এসে মেজর রুমালে কপাল মুছে চারপাশে তাকালেন। অর্জুন বুঝল, তাকে দেখেও ঠাহর করতে পারলেন না মেজর। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, মহিলাকে মেজর বলছেন, "না। এরকমটা তো হওয়ার কথা নয়। লুসি, তুমি জানো না, আমরা দু'জনে কত অভিযান একসঙ্গে করেছি। কখনওই অর্জুনকে আমি শৃঙ্খলা ভাঙতে দেখিনি। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ও চলে। চিন্তা হচ্ছে, এখানে আসতে গিয়ে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো!"

মহিলা, যাঁর নাম লুসি, বললেন, "হয়তো উনি যা নন, তাই ভেবে নিয়েছ তুমি। আমার এক বন্ধু বলেছিল, ইন্ডিয়ানরা আর যাই করে করুক, সময় রেখে চলতে শেখেনি। কিন্তু কথাটা হল, আর কতক্ষণ ওঁর জন্য অপেক্ষা করবে?"

"অনন্তকাল। কিন্তু লুসি, হোয়াট এ চেঞ্জ! এই এয়ারপোর্টের চেহারা একদম বদলে গিয়েছে। এমনও হতে পারে, অর্জুন বাইরে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

"আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। লেট্স গো।"

ওঁরা মূল দরজার দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, অর্জুন তাঁদের অনুসরণ করল। গেটের বাইরে ওরা চলে যেতেই অর্জুন প্রি-পেড ট্যাক্সিবুথে গিয়ে শিলিগুড়ির জন্য ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে রসিদ নিল। সেটায় ট্যাক্সির নম্বর লেখা রয়েছে। আগে বাইরে বের হলে ঝাঁপিয়ে পড়ত ড্রাইভাররা। টানাটানি করত প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে। দরাদরি করার পর তাদের ট্যাক্সিতে উঠতে হত। এখন সেই অরাজকতা নেই। প্রি-পেড ছাড়া ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। যাত্রীরা কে কোথায় যাবে, তার কিলোমিটার অনুযায়ী ট্যাক্সিভাড়া ঠিক করা আছে। দরাদরির কোনও ঝামেলা নেই।

রসিদটা নিয়ে বাইরে বের হতেই অর্জুন দেখল, মেজর চুরুট ধরাবার চেষ্টা করছেন। সে পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, "সরি স্যার। এখানে চুরুট ধরালে আপনাকে এক হাজার টাকা ফাইন দিতে হবে।"

প্রবল বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে মেজর যেভাবে চিৎকার করে উঠলেন, তা কানে গেলে জলদাপাড়া ফরেস্টের সমস্ত গন্ডার পড়ি কি মরি করে পালিয়ে যেত। দু'হাতে অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখে কাঁচাপাকা দাড়ির জঙ্গল চেপে ধরে বলতে লাগলেন, "ওঃ, কতদিন পরে দেখা হল। খুব মনে পড়ে তোমার কথা। অথচ তুমি আমায় একদম ভুলে গেলে মাই ডিয়ার থার্ড পাণ্ডব!"

কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে অর্জুন বলল, "ভুল বললেন, আপনাকে আমি কখনও ভুলতে পারি?"

এক পা পিছিয়ে গিয়ে মেজর অর্জুনের আপাদমস্তক দেখে নিলেন, "নাঃ, একই রকম আছ। নো এক্সট্রা ফ্যাট। আমি চার কেজি বেড়েছি। গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট পরতে হচ্ছে হে। ওহো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে লুসি। শব্দ নিয়ে গবেষণা করে বস্টন ইউনিভার্সিটিতে। আর লুসি, ইনি হলেন...।"

মেজরের কথা থামিয়ে দিয়ে লুসি বললেন, "বুঝেছি। ইনি অর্জুন।"

"কী করে বুঝলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"সেই জে এফ কে থেকে আপনার নাম অন্তত পাঁচশোবার শুনতে বাধ্য হয়েছি। আপনার মতো বুদ্ধিমান বিনয়ী ছেলে নাকি পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না।"

"স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি নর্থ বেঙ্গলে এর আগে কখনও এসেছেন?"

মাথা নাড়লেন লুসি, "নো। কখনওই আসিনি।"

এই সময় একটি লোক এসে সামনে দাঁড়াল, "স্যার, আপনারা কি প্রি-পেড ট্যাক্সি নিয়েছেন? সব প্যাসেঞ্জার চলে যাচ্ছে...।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। তোমার ট্যাক্সি কোথায়?"

মেজর এবং লুসি মালপত্র ডিকিতে রেখে পিছনের আসনে উঠে বসলে অর্জুন ড্রাইভারের পাশে উঠে পড়ল। মেজর বললেন, "আচ্ছা! তুমি আগেই ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলে আর লুসি ভাবছিল যে আসোইনি।"

কথাটা বাংলায় বললেন মেজর, যদিও নিজের নামটা শুনতে পেয়ে লুসি উৎসুক চোখে তাকালেন।

"এখন এটাই সিস্টেম এখানে। কোথায় যাবেন জানি না বলে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বুক করেছি এটাকে।" কথা বলতে-বলতে অর্জুন দেখল, এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা সৈনিকরা সাইকেলে চেপে তাঁদের কাজে যাচ্ছেন। পুরো এলাকাটা এয়ারফোর্সের অধীনে। সাধারণ যাত্রীরা গাড়িতে চেপে এয়ারপোর্টে আসার পথে কিছু নিয়মকানুন মানতে বাধ্য।

"শিলিগুড়ি!" মেজর মাথা নাড়লেন, "কেন শিলিগুড়ি? হোয়াই নট জলপাইগুড়ি?"

"আপনি তো কিছু বলেননি! এখন বলুন কোথায় যেতে চান, কী আপনাদের প্রোগ্রাম, সেইমতো ব্যবস্থা করছি।" অর্জুন ফিরে তাকাল।

লুসি বসে আছে জানলার বাইরে চোখ রেখে। মেজরের ঠোঁটে সেই চুরুটটা ধরাই রয়েছে, এখনও আগুন দেননি।

"লুসির ইচ্ছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার কোনও গভীর জঙ্গলে ক'দিন থাকবে। বিশেষ করে যেসব জঙ্গলে নানাধরনের পাখি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেইসব জায়গায় যদি ব্যবস্থা করতে পারো, তা হলে খুব ভাল হয়।" মেজর বললেন।

অর্জুন একটু ভাবল। যে-কোনও ফরেস্ট বাংলোয় গেলে আজকাল চটপট জায়গা পাওয়া যায় না। বাংলোগুলোয় যেমন দপ্তরের অফিসাররা কাজেকর্মে প্রায়ই আসেন, তেমনই টুরিস্টরাও কলকাতা থেকে বুক করে বেড়াতে আসেন। পনেরো-কুড়ি বছর আগে এই ঝোঁকটা ছিল না। উত্তর বাংলায় ফরেস্ট বাংলো বলতে গোরুমারা,

চাপড়ামারি, খুঁটিমারি, হলং আর মাদারিহাট বাংলো। কোথায় বেশি পাখি আসে, এই মুহূর্তে অর্জুনের জানা নেই। সে শুনেছে, কাজিরাঙা ফরেস্ট বাংলোতে নাকি এখনও গভীর জঙ্গল থাকায় পশু এবং পাখিদের সংখ্যা বেশি। তবে কাজিরাঙা তো অসমে। অর্জুন সিদ্ধান্ত নিল, একমাত্র জলপাইগুড়ির ডি এফ ও এই ব্যাপারে সঠিক সাহায্য করতে পারেন। সে বলল, "তা হলে আগে জলপাইগুড়ির ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসে যেতে হয়। ওখানেই সব খবর পাওয়া যাবে।"

শিলিগুড়ি শহরের মহানন্দা নদীর উপর সেতু চওড়া করে দেওয়ায় এখন তেমন জ্যাম হয় না। কিন্তু আজ হয়েছে। মিনিটতিনেক গাড়িতে বসে থাকার পর ড্রাইভার নেমে গেল ব্যাপারটা কী জানতে। ফিরে এসে বলল, "খুব বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সাব। একজন স্পট ডেড। যে গাড়িটা মেরেছে সেটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন ভাঙা গাড়ি রাস্তা ব্লক করে দিয়েছে। আমি যে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাব তার কোনও উপায় নেই। কখন যে খুলবে কে জানে, আপনারা একটু হেঁটে গেলে এয়ারভিউ হোটেলের সামনে আবার ট্যাক্সি পেয়ে যাবেন।"

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল। তিনি মাথা নাড়লেন, "ইমপসিব্‌ল। এত পাহাড় বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

একমত হল অর্জুন। যতই চাকা লাগানো থাক, এত সুটকেস টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। মিনিটতিনেকের মধ্যে গাড়ির হর্ন বাজতে লাগল, ইঞ্জিনের আওয়াজ, চেঁচামেচি থেকে বোঝা গেল সামনের বাধা সরানো হয়েছে। তাদের ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে মেজর বললেন, "বুঝলে অর্জুন, পেশেন্স। এই পেশেন্সের বিকল্প আর কিছু নেই।"

জলপাইগুড়ি শহরে ওরা যখন পৌঁছোল তখন বিকেল। এখন দু'-তিনটে মোটামুটি কাজ চালানোর হোটেল হয়েছে শহরে। তবে সবচেয়ে ভাল থাকার জায়গা রাজবাড়ি ছাড়িয়ে সরকারি অতিথিনিবাস। সেখানে যাওয়ার আগে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ডি এফ ও অফিসে হাজির হল অর্জুনরা।

ডি এফ ও অফিসের বড়বাবু অর্জুনকে দেখেই চিনতে পেরে হেসে বললেন, "কী ব্যাপার? জঙ্গল নিয়ে কোনও সমস্যা?"

"না। সমস্যা নয়। ইনি মেজর আর উনি লুসি। মেজর আমার দীর্ঘকালের পরিচিত। ওঁরা আমেরিকা থেকে আসছেন। কয়েকদিন জঙ্গলে থাকতে চান। যে জঙ্গলে প্রচুর পাখি আছে, সেই জঙ্গলে থাকার ব্যবস্থা করে দিন।" অর্জুন বলল।

"পাখি আসে শীতকালে। জঙ্গলের লেকগুলো বিদেশি পাখিতে ভরে যায়। এখন তো তেমন...।" বড়বাবু মাথা নাড়লেন।

"বিদেশি পাখির জন্য বিদেশ থেকে এদেশে আসব কেন? দিশি পাখি যেখানে বেশি পাওয়া যায় সেখানে যেতে চাই।" মেজর প্রায় ধমকের ভঙ্গিতে বললেন।

বড়বাবু ওঁদের নিয়ে গেলেন তাঁর বড়সাহেবের চেম্বারে। অবাঙালি ডি এফ ও অর্জুনের নাম শুনে হাত বাড়ালেন, "আমি আপনার নাম শুনেছি।"

করমর্দন করে অর্জুন প্রস্তাবটা জানাল।

ডি এফ ও বড়বাবুকে নির্দেশ দিলেন কোন ফরেস্ট বাংলো খালি আছে তা দেখার জন্য। তারপর গল্প শুরু করলেন। কেন লুসি পাখির ডাক শুনতে চান? লুসি তাঁকে জানালেন, ইতিমধ্যে আফ্রিকার কিছু অঞ্চল এবং আমেরিকার পাখিদের ডাক তিনি সংগ্রহ করে দেখেছেন, দুই মহাদেশের কিছু পাখির ডাক হুবহু এক। অথচ এরা এক প্রজাতির নয়। এদের ডানায় সেই শক্তি নেই যে, সমুদ্র পেরিয়ে দুই মহাদেশে যাতায়াত করতে পারবে। লুসি শুনেছেন, ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে নাকি প্রচুর পাখি পাওয়া যায়। তিনি ওদের গলার স্বর রেকর্ড করতে চান। তিনি প্রমাণ করতে চান, পৃথিবীর যে প্রান্তেই জন্মাক, পাখিদের ভাষায় বেশ মিল আছে। আফ্রিকান পাখির ডাক টেপে তুলে সেটা আমেরিকার জঙ্গলে বাজিয়ে শুনেছেন, একটি পাখি তাতে সাড়া দিচ্ছে। সে ভাবছে, তারই সঙ্গী কেউ তাকে ডাকছে।

বড়বাবু এসে জানালেন, একমাত্র খুঁটিমারি ছাড়া আর কোনও বাংলোতে জায়গা নেই। অর্জুন জলদাপাড়ার কথা বলল। ডি এফ ও বললেন, "ওটা কোচবিহারের ডি এফ ও-র এলাকা। খুঁটিমারির জঙ্গল যদিও খুব ঘন নয়, কিন্তু ওখানে পাখি পাবেন। তা ছাড়া সঙ্গে যদি গাড়ি থাকে, তা হলে যে-কোনও জঙ্গলে গিয়ে লুসি তাঁর কাজ করতে পারবেন।" বড়বাবুকে ওই অনুমতি লিখিতভাবে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।

কদমতলার মোড়ে এসে শিলিগুড়ির ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পরিচিত একটি নেপালি ড্রাইভারকে কয়েকদিনের জন্য সঙ্গী করে নিল অর্জুন। তারপর মোবাইল বের করে বাড়িতে ফোন করে মাকে জানিয়ে দিল কোথায় যাচ্ছে।

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে ময়নাগুড়ি বাইপাস দিয়ে যখন নেপালি ড্রাইভার তার মারুতি ঝড়ের বেগে চালাচ্ছে, তখন মেজর বললেন, "ওহে তৃতীয় পাণ্ডব, পেটে কিছু দেওয়া যাবে না?"

"ওহো! কিন্তু এখানে খেতে হলে কোনও ধাবার সামনে দাঁড়াতে হবে।"

"যে চুলোয় হোক, পেটের নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে।"

ড্রাইভারের নাম পদমবাহাদুর। ধূপগুড়ির পথে একটা ধাবার সামনে সে গাড়ি দাঁড় করাল। অর্জুন গাড়ি থেকে নামতে-নামতে দেখল, ধাবা থেকে দুটো লোক খুব দ্রুত বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ানো সুমো গাড়িতে উঠে বসল। তারপর স্টার্ট নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ধূপগুড়ির দিকে। ওদের চলে যাওয়ার ধরনটা বেশ অস্বাভাবিক।

ধাবাতে ঢুকতেই গলা শুনতে পেল অর্জুন, "আইয়ে সাব। বহুত দিন পর আপ আয়া।" বিশাল চেহারার সর্দারজিকে দেখে মনে পড়ে গেল অর্জুনের। লোকটার নাম জ্ঞান সিংহ। এর আগে এই ধাবায় খেতে এসে আলাপ হয়েছিল।

"কেমন আছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"কোনওরকমে চলে যাচ্ছে। বসুন। প্লিজ সিট ডাউন।" ইংরেজিতে অনুরোধ মেজর এবং লুসিকে।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন "কী পাওয়া যাবে?"

জ্ঞান সিংহ বলল, "চিকেন, মাটন ফিশ কারি, কষা, চাঁপ, কাবাব। সঙ্গে রাইস, প্লেন রুটি, তন্দুরি। নবরতন তরকারি।"

"আমাকে চিকেন চাঁপ, তন্দুরি রুটি আর এই ভদ্রমহিলাকে চিকেন কাবাব দিন। অর্জুন তুমি কী খাবে?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি হাফ প্লেট কাবাব নেব।" অর্জুন বলল।

লুসি এসব কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'চিকেন স্যান্ডউইচ বলুন আমার জন্য।"

জ্ঞান সিংহ মাথা নাড়ল, "নো ম্যাডাম নো স্যান্ডউইচ।"

মেজর লুসিকে আশ্বস্ত করলেন, যে খাবার বলা হয়েছে তাতে লুসির অসুবিধে হবে না। কোনও মশলা নেই তাতে।

জ্ঞান সিংহ অর্ডারগুলো সহকারীদের জানিয়ে দেওয়ার পরে কাছে এলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওই লোকগুলো আমাদের দেখেই কি ওইভাবে পালাল?"

জ্ঞান সিংহ হাসল, "আপনাকে যারা চেনে, তারা হয় হেসে আপ্যায়ন করে, নয়তো দৌড়ে পালায়।"

"আচ্ছা, এদের পালাবার কারণ?"

"আপনি গাড়ির সাইডটা দেখেননি, না? অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ওদের কথাবার্তায় মনে হল, কেউ মারাও গেছে। ওরা শিলিগুড়ি থেকে আসছে।"

জ্ঞান সিংহের কথায় মহানন্দা ব্রিজের উপর ঘটা দুর্ঘটনার কথা

boiRboi.net

খেয়ালে এল। লোক দুটো কেন থানায় রিপোর্ট না করে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে? অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি যখন বুঝতে পারলেন, তখন ওদের আটকাবার চেষ্টা করলেন না কেন?"

"দেখুন সাব, আমার এখানে হাজার রকমের মানুষ খেতে আসে। কার মনে কী মতলব আছে তা বুঝব কী করে? আপনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে যেভাবে পালাল, তাতেই বুঝলাম ওরা ক্রিমিনাল। তখন তো কিছু করার ছিল না। তা ছাড়া আমি যদি আমার ধাবায় ক্রিমিনাল ধরি তা হলে কাল থেকে কোনও গাড়ি আর এখানে দাঁড়াবে না। না খেয়ে মরতে হবে আমাকে।" জ্ঞান সিংহ বলল।

কিছু বলার ছিল না একথা শোনবার পর। কিন্তু অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না অর্জুনের। শিলিগুড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে। ধরা পড়ার ভয়ে অনেকেই পালিয়ে যায়। কিন্তু তাকে দেখে ওরা ওভাবে পালাল কেন? যেখানে ওই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তার ধারেকাছে ওদের গাড়ি ছিল না। পিছনের লম্বা গাড়ির লাইনে কে কোথায় রয়েছে, তা দেখার কোনও সুযোগই ছিল না এদের। এ ক্ষেত্রে দু'টো চিন্তাই মাথায় আসছে। এক, এরা দাগি অপরাধী, তাকে আগে থেকেই চিনত। নয়তো এরাও এয়ারপোর্ট থেকে আসছিল। সেখানে মেজরদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখেছে। এই দ্বিতীয় ভাবনাটা তেমন জোরদার নয়। অচেনা তিনটে মানুষকে এয়ারপোর্টে দেখলে কেউ সেটা মনে রাখে না। রাখলেও তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালাবার কথা ভাবে না।

চিকেন রেশমি কাবাব মুখে দিয়ে লুসি খুব খুশি। মশলা নেই, বেশ তুলতুলে, নরম। জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ওখানে অনেক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানে কি এই খাবার পাওয়া যায়?"

তন্দুরি রুটিতে মাংস তুলে মুখে পুরতে-পুরতে মেজরের চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় বললেন, "ওঃ! শিওর। তোমরা তো সেদ্ধ ছাড়া কিছু খেতে জানলে না। ভাল খাবার খেতে হলে ওই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ঢুকতে হবে।"

ধূপগুড়ি পেরিয়ে গয়েরকাটা হয়ে নাথুয়ার দিকে যখন গাড়ি ঘোরাল পদমবাহাদুর, তখন ছায়া ঘন হয়ে গিয়েছে। দূরে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "আর কত দূরে হে?"

"এই তো সামনে মেছুয়া পুল, ওটা পার হলেই জঙ্গলে ঢুকব," অর্জুন বলল।

"নেহি সাব। মেছুয়া পুল কা নাম চেঞ্জ হো গয়া," পদমবাহাদুর বলল।

"তাই নাকি? কী নাম হয়েছে?" অর্জুন অবাক হল।

"মধুবনি," পদম জবাব দিল।

দু'পাশে এখন ঘরে ফেরা পাখির চিৎকার। লুসি উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে। অর্জুন দেখল, জঙ্গল বেশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তবু অন্ধকার নেমে পড়ায় চারপাশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। জঙ্গলের মধ্যে নুড়ি বিছানো রাস্তায় চাকার শব্দ তুলে পদম গাড়িটাকে বাংলোর সামনে দাঁড় করিয়ে মৃদু হর্ন বাজাল। বাংলো অন্ধকার। পিছন দিকে ছোট একতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। পদম চেঁচাল, "কোই হ্যায়?"

একটা হারিকেন উপরে তুলে যে লোকটা এগিয়ে এল, তার মুখে রাজ্যের বিরক্তি। অর্জুন বলল, "তুমি নিশ্চয়ই চৌকিদার?"

"জি।"

"আমরা জলপাইগুড়ি থেকে আসছি। ডি এফ ও সাহেব এই বাংলোয় থাকার অনুমতি দিয়েছেন। দরজা খুলে দাও।"

"চাবি তো আমার কাছে নেই সাহেব।"

"যার কাছে আছে তাকে ডেকে নিয়ে এসো।"

লোকটা লণ্ঠন হাতে গেটের দিকে চলে গেল। কথাবার্তা হচ্ছিল বাংলায়। লুসির পক্ষে বোঝার উপায় নেই। মেজর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে লুসি জিভ দিয়ে আওয়াজ করল, যাতে তিনি চুপ করে থাকেন। শব্দটা কানে এল। এই ভর সন্ধেবেলায় পাখিটা ডাকছে, 'চোখ গেল।' একা-একাই ডেকে যাচ্ছে।

লুসি দ্রুত তাঁর ব্যাগ খুলে রেকর্ডার বের করার আগেই ডাক থেমে গেল। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঝিঁঝির ডাক শোনা গেল। লুসি খুব হতাশ হয়ে বললেন, "আপনারা ওই পাখিটার কী নাম দিয়েছেন?'

"চোখ গেল।" অর্জুন বলল।

"মানে কী?"

মেজর তাঁর মতো করে বুঝিয়ে দিলেন লুসিকে। লুসি হাসলেন, "মাই গড। ফ্লোরিডার জঙ্গলে অবিকল একই ডাক শুনেছি আমি। স্থানীয় মানুষ বলেন, পাখিটা গালাগাল দিচ্ছে, 'গো হেল'। অদ্ভুত! কোথায় খুঁটিমারির জঙ্গল আর কোথায় ফ্লোরিডা!"

লণ্ঠনটাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কেয়ারটেকার বাঙালি। বললেন, "জলপাইগুড়ি থেকে কোনও অর্ডার এখনও আসেনি। অ্যাডভান্স কপি সঙ্গে থাকলে আপনারা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। অনেক অবাঞ্ছিত লোক এখানে এসে টাকা দিয়ে থাকতে চায়। তাদের আমি অ্যালাউ করি না।"

ডি এফ ও সাহেবের অর্ডার হারিকেনের আলোয় দেখে নিয়ে কর্মচারীটিকে জেনারেটর চালাতে বললেন কেয়ারটেকার। কয়েক মিনিটের মধ্যে চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠলেও জেনারেটরের শব্দ ভাল লাগছিল না।

দোতলায় দুটো সুন্দর সাজানো ঘর। ওপাশের লম্বা বারান্দায় সোফা পাতা। দোতলা থেকে এ পাশের জঙ্গলটার অন্ধকার আরও রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

"আপনারা ডিনার করবেন তো?" কেয়ারটেকার জিজ্ঞেস করলেন।

"কী খাওয়াবেন?" মেজর ঘুরে দাঁড়ালেন।

"আজ রাতে ডিম আর রুটি ছাড়া কিছু পারব না স্যার।"

"তাই হোক। মেমসাহেবের জন্যে ঝাল দেবেন না।"

অর্জুন হাসল, "আজ একটা অভিনব ব্যাপার দেখছি।"

"কী হে?" মেজর ঘুরে তাকালেন।

"এয়ারপোর্ট থেকে এখন পর্যন্ত আপনি একবারও নিব বের করে চুমুক দেননি। এরকম তো আগে কখনও দেখিনি," অর্জুন বলল।

"নিব? আপনি হুইস্কি-রামের কথা বলছেন। না স্যার, ওসব বিলিতি জিনিস এই জঙ্গলে পাবেন না। তবে অর্ডার দিলে গয়েরকাটা থেকে আনিয়ে দিতে পারি। গাড়ি তো আছেই," কেয়ারটেকার সবিনয়ে জানালেন।

তাঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র মেজর চিৎকার শুরু করলেন, "গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার। আমাকে, এই মেজরকে বলে কিনা হুইস্কি-রাম কিনে এনে দেবে। সারা জীবনে ওসব কত খেয়েছি তা কি জানো ছোকরা? হুম! আজ তিনমাস হল আমি ওসব ত্যাগ করেছি। আর সেই আমার কানের কাছে ওই নামগুলো না জপলে চলছিল না!"

অর্জুন বলল, "আমি সত্যি দুঃখিত। আপনি যে এতদিনের অভ্যেস ছেড়ে দিয়েছেন, এই খবর আমার জানা ছিল না।"

"না জানা থাক, আমাকে দেখে তুমি বুঝতে পারছ না? সব সময় কীরকম ঝিমিয়ে আছি। আগের মতো আজ সারাদিনে কোনও চেঁচামেচি করেছি? ধাবায় বসে যখন খাচ্ছিলাম, তখন যেদিকে লোকেরা বিয়ার খাচ্ছিল, সেদিকে দ্বিতীয়বার তাকাইনি। নো মোর হুইস্কি-রাম! সব হাডসনের জলে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি হে।" বেশ জোরে শ্বাস ফেললেন মেজর।

রাতের খাওয়ার পর বারান্দায় বসেছিল ওরা। দশটা বাজতেই জেনারেটর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওটা বন্ধ হওয়ায় আলো নিভে গিয়েছে। পাখা ঘুরছে না বটে, কিন্তু মনে হল এরই নাম শান্তি। কর্কশ

BanglaBook.org

একটানা আওয়াজটা আর কানের পরদাকে বিব্রত করছে না। আর শব্দটা থেমে যাওয়ার খানিক বাদেই সামনের জঙ্গল থেকে অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। রাত-পাখিরা এখন মাঝে-মাঝেই ডেকে উঠছে। হঠাৎ কোনও প্রাণী জানান দিল, 'কিট-কিট-কিট কিটুস।'

হঠাৎ লুসি বললেন, "লেট্‌স গো।"

মেজরের বোধ হয় ঘুম পাচ্ছিল। বললেন, "সেই ভাল, ঘুমোতে যাই চলো।"

"ওঃ! নো। টর্চ নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গেলে ওইসব ডাক খুব ভালভাবে রেকর্ড করতে পারব আমরা। এটাই ঠিক সময়। আজেবাজে আওয়াজ এখন নেই," লুসি বেশ উত্তেজিত হয়ে নতুন একটা ডাক শুনলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান?"

"মানে?"

"এখন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে কাল সকালে যদি আপনার শরীর কেউ খুঁজে পায়, তা হলে দেখে চিনতে পারবে না! এদিকের জঙ্গলে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে প্রায় শ'খানেক হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। জঙ্গলে তাদের খাবার নেই বলে হামলা করছে পাশের গ্রামগুলোতে। গ্রামবাসীরা স্বাভাবিক কারণে ওদের বাধা দেয়। ফলে হাতিরা মানুষ দেখলেই খেপে ওঠে। হাতি ছাড়া চিতাবাঘের সংখ্যাও বাড়ছে। আপনি তো জানেন, চিতাদের মতো হিংস্র প্রাণী খুব বেশি নেই।" অর্জুন বলল।

"আপনি আমাকে অযথা ভয় দেখাচ্ছেন না তো?" লুসির গলায় সন্দেহ।

"আমার কী লাভ?"

"আচ্ছা, আমরা তো বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যে থেকে রেকর্ড করতে পারি।"

"যাওয়ার মধ্যে আমি নেই। আমার ঘুম পেয়েছে খুব," হাই তুলতে-তুলতে মেজর ঘরে ঢুকে গেলেন।

অর্জুন বলল, "লুসি, আমার মনে হয়, আজ রাতে আপনার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আগামীকাল থেকে আমরা পরিকল্পনা করব, যাতে আপনি রাতের পাখিদের ডাক ভালভাবে তুলতে পারেন।"

লুসি একটু ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে 'গুড নাইট' বলে চলে গেলেন নিজের ঘরে। অর্জুন বারান্দার রেলিং ধরে জঙ্গলের দিকে তাকাল। হঠাৎ সে খেয়াল করল অন্ধকারে কী একটা নড়ছে। ওরা যে একটা হাতির দল, তা বুঝতে সময় লাগল না। খুব খেপে না গেলে ওরা বাংলোর কম্পাউন্ডে ঢোকে না, এই বাঁচোয়া!

এই বাংলোর দোতলায় দুটো ঘর। একটা ঘরে লুসি রয়েছেন, দ্বিতীয়টায় মেজর আর অর্জুন। হঠাৎ কানে এল শব্দ। যেন বুনো দাঁতাল শুয়োর মারপিট করছে ঘরের মধ্যে। কৌতূহলী হয়ে সে অন্ধকার ঘরের দরজায় এসেই বুঝতে পারল, মেজর নাক ডাকছেন! এই রকম ডাককেই কি গর্জন বলে? এই গর্জন কানে নিয়ে সে পাশের খাটে ঘুমোবে কী করে? তারপরেই টের পেল বাংলোয় মৃদু কাঁপুনি হচ্ছে। এই সময় লুসির ঘরের দরজা খুলে গেল।

লুসি জিজ্ঞেস করলেন, "কীসের আওয়াজ হচ্ছে?"

অর্জুন হাসল, "আপনার রেকর্ডারটা নিয়ে আসুন।"

লুসি ঘরে ঢুকেই চাপা গলায় বললেন, "ওঃ মাই গড!" তারপর দৌড়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রেকর্ডার চালু করলেন লুসি। মেজরের নাক থেকে যে বিচিত্র শব্দাবলি ফোয়ারার মতো বের হচ্ছিল, তা টেপ রেকর্ডার গিলে নিতে লাগল।

মিনিটপাঁচেক পরে ক্লান্ত হলেন লুসি। রেকর্ডার নিয়ে ফিরে গেলেন ঘরে। আর কী আশ্চর্য, মেজর পাশ ফিরতেই আচমকা আওয়াজটা থেমে গেল। এখন মৃদু শ্বাসের শব্দ, যা কানে গেলেও ঘুমোতে অসুবিধে হবে না। ওই ভয়ংকর আওয়াজ যদি সমান তালে চলত, তা হলে এই ঘরে তার পক্ষে ঘুমনো সম্ভব হত না। সারা রাত বাইরের বারান্দায় কাটাতে হত সে ক্ষেত্রে। মেজর আবার শব্দ করার আগে ঘুমিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মোবাইলটা দেখল অর্জুন। বাঃ, এখানে নেটওয়ার্ক আছে। ওটাকে বালিশের পাশে রেখে শুয়ে পড়ল সে। আর তখনই জঙ্গল থেকে ভেসে আসা আওয়াজ তার কানে এল। সেই আওয়াজ হাওয়ার জন্য, রাত-পাখি আর প্রাণীদের হাঁকাহাকির কারণে হতে পারে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে তা শুনতে-শুনতে অর্জুনের বেশ রহস্যময় বলে মনে হল।

"অর্জুন, অর্জুন। হ্যালো হ্যালো! অর্জুন, শুনতে পাচ্ছ?"

একটা কণ্ঠস্বর অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল। আগেকার দিনে, যখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলে তবেই দূর দেশের লোক টেলিফোনে কথা শুনতে পেত, সেই রকমের শব্দ। যা মিহি হতে-হতে কানের পরদায় এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকা অর্জুন ক্রমাগত সেই ডাক শুনতে-শুনতে অস্ফুটে 'উঁ' বলল।

"অর্জুন, অর্জুন। হ্যালো, হ্যালো! অর্জুন শুনতে পাচ্ছ?"

কণ্ঠস্বর চেনা যাচ্ছে না, খুব মিহি। ঘুমন্ত অর্জুন কোনওমতে সাড়া দিল, "হ্যাঁ, পাচ্ছি, পাচ্ছি।"

"উঠে পড়ো, এখনই ঘুম থেকে উঠে পড়ো। দিনে ঘুমোও, রাতে জাগো। অর্জুন, অর্জুন। হ্যালো, হ্যালো!" গলার স্বর যেন পরিচিত, অমলদার নয়, অনেকটা বিষ্টুসাহেবের মতো।

তারপর আর কোনও সাড়া নেই। যেন গভীর জলের নীচ থেকে ভুস করে উপরে উঠে এল অর্জুন। ঘুম ভেঙে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে মাথার ভিতরটা টনটন করে উঠল। দু'হাতে কপালের দু'পাশের শিরা চেপে ধরল। মেজর আবার নাক ডাকছেন, তবে এবার মৃদু আওয়াজ হচ্ছে। অর্জুন মাথা ঝাঁকাল। মাথা ধরে গিয়েছে প্রচণ্ড। এরকম বিশ্রী স্বপ্ন সে কখনও দেখেনি। না, ঠিক হল না। দেখা নয়, শোনেনি। স্বপ্ন কি কেউ শোনে? কিন্তু সে তো কিছু দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। তাকে কেউ যে ডাকছিল সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আজব ব্যাপার! মাথা ধরা সারাবার কোনও ট্যাবলেট সঙ্গে নেই। সে আবার শোওয়ার জন্য বালিশে মাথা রাখতেই দেখতে পেল, মোবাইলের আলোটা টুপ করে নিভে গেল। মোবাইল সে অন করে শুয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওটা তো লক হয়ে থাকার কথা!

মোবাইল তুলে নিয়ে লকটা খুলতে কোনও মিস্‌ড কল ফুটে উঠল না। কল রেজিস্টারে গিয়ে রিসিভ্‌ড কলে যেতেই ফুটে উঠল 'নম্বর আননোন'। আননোন নম্বর থেকে ফোন এসেছিল? সাধারণত বিদেশের ফোন এলে পুরোটা ফুটে ওঠে না। সে টাইম অফ কল দেখতে চাইল। দেখে হতভম্ব হয়ে গেল অর্জুন। রাত দুটো পনেরো, তারিখ আজকের। অর্থাৎ রাত বারোটার পর যে দিনটা শুরু হয়েছে সেই দিনের। তার মানে, এই মোবাইলে কল এসেছিল। কিন্তু রিং হয়নি। রিং হলে সেই আওয়াজে তার ঘুম নির্ঘাত ভেঙে যেত। কিন্তু কল এসেছিল একটু আগে, যখন সে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় কী করে, যে ফোন করেছিল তার কণ্ঠস্বর সে শুনতে পারে? অথচ একটা ফোন এসেছিল ওই মোবাইলে কিন্তু রিং হয়নি। নম্বর ওঠেনি এটা প্রমাণিত।

বাথরুমে গিয়ে বেসিন খুলে ঘাড়ে-মুখে জল দিল অর্জুন। কিন্তু মাথার ভিতরের দপদপানিটা থামছিল না। বহু দূর থেকে কথা বললে যে রকম শুনতে লাগে, সেই রকম শোনাচ্ছিল লোকটার গলা। 'ঘুম থেকে উঠে পড়ো, দিনে ঘুমাও, রাতে জাগো।'

দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় পা বাড়ানোর আগে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল অর্জুন। অনেকটা ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ এখন জঙ্গলের

মাথায়। শেয়াল ডাকছে দূরে। এখন অন্ধকার অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে। গাছেদের রহস্য তরল।

অর্জুন রেলিংয়ের ধারঘেঁষা সোফায় বসল। কে বলল কথাটা? এ কিছু থাকতে, ঘুম থেকে উঠে পড়তে বলল কেন? হাসল অর্জুন, ওর পক্ষে কি রাতে না ঘুমিয়ে দিনে ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব? তা ছাড়া করবেই বা কেন?

মাথা ধরাটা যাচ্ছে না, ঘুমও আসছে না। মেজরের নাক ডাকার শব্দ প্রথম রাতের মতো ভয়ংকর নয়। মেজর বেশ বদলে গিয়েছেন। ভেজা মুড়ির মতো লাগছে এবার। সেটা মদ্যপান ছাড়ার কারণে না বয়স বাড়ার জন্য, বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হুদ্দিতম্বি, চিৎকার করে কথা না বললে মেজরকে মানায় না।

হঠাৎ একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। গয়েরকাটা-নাথুয়ার রাস্তাটা বাংলো থেকে বেশি দূরে নয়। এত রাতে বিশেষ প্রয়োজনে কোনও গাড়ি যেতেই পারে। কিন্তু অর্জুনের কান সজাগ হল। ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে তো গেলই না, বরং কাছে এগিয়ে আসছে। কোনও গাড়ি যে বাংলোর গেটে পৌঁছে গিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু গাড়ির হেডলাইটের আলো কোথায়? এত রাতে কোনও গাড়ি আলো নিভিয়ে আসবে কেন? আলো জ্বাললে তো নীচের বাগান, লন, সামনের জঙ্গলের কিছুটা আলোকিত হয়ে যেত। অর্জুন নিঃশব্দে বারান্দার কোনায় চলে এসে শরীরটা যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে, গেটের দিকে তাকাতেই গাড়িটাকে দেখতে পেল। ফিকে অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল ওটা সুমো। আলো নিভিয়ে চুপচাপ বাংলোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আবার ইঞ্জিন চালু হল। উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুমো দাঁড়িয়ে গেল। প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে দু'টো লোক গাড়ি থেকে নামল। তারপর গেট খুলে চুপচাপ বাংলোর বাগানে চলে এসে উপরের দিকে তাকাল। সম্ভবত অন্ধকার বাংলো ওদের বিভ্রান্ত করছিল। তারপর ওপাশ দিয়ে হেঁটে চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা।

এত রাতে কেউ আশ্রয় পাওয়ার জন্য কোনও বাংলোয় এলে এমন চোরের মতো আচরণ করে না। চিৎকার করে দরোয়ানকে ডাকবে। অতএব লোক দুটো যে অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছে, এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। এখন কী করা উচিত? অর্জুন ভাবল। সোজা নীচে নেমে ওদের চ্যালেঞ্জ করবে। ওরা তো বলতেই পারে, এখানে থাকার জায়গা খুঁজতে এসেছিল। সব অন্ধকার দেখে মনে হয়েছে, ডেকে কোনও লাভ হবে না। এটুকু জানিয়ে চলে গেলে সে কিছুই করতে পারবে না।

মিনিটতিনেক পরে কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হল জুতোর। ওরা উপরে উঠছে। অর্জুন সোজা সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁক নিয়ে ওরা উপরের সিঁড়িতে পা রাখতেই মুখ তুলে অর্জুনের ছায়ামূর্তি দেখে থমকে গেল।

অর্জুন পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, "কে আপনারা? কী চাই?"

ওদের মুখ অন্ধকারের জন্যে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ লম্বা লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা দ্রুত বের করতেই অর্জুন বিদ্যুৎবেগে দেওয়ালের আড়ালে সরে এল। লোকটা যে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বের করছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার পরই দুদ্দাড় শব্দ তুলে লোক দু'টো বাংলো থেকে নেমে গাড়ির দিকে ছুটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়িটা হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে গেল পিচের রাস্তার দিকে।

অর্জুন ফিরে গেল বারান্দায়। সোফায় বসামাত্র কথাটা মনে এল, "এখনই ঘুম থেকে উঠে পড়ো। দিনে ঘুমোও, রাতে জাগো।"

যদি তাকে কেউ এই কথাগুলো না বলত, যদি তার ঘুম না ভাঙিয়ে দিত, তা হলে...! থমকাল অর্জুন। লোক দুটো কী উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এত রাতে এই বাংলোয় এসেছিল, তা জানার উপায় আপাতত নেই। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সে। আজ জ্ঞান সিংহের ধাবা থেকে যে লোক দু'টো সুমোয় করে পালিয়ে গিয়েছিল, যারা শিলিগুড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, সেই লোক দু'টো কি এরাই?

অন্ধকারের আড়ালে থাকায় সুমো গাড়ির চেহারা দেখা যায়নি। কিন্তু ওই লোক দু'টোর শরীরের আদলের খুব মিল আছে ধাবার

সামনের লোক দু'টোর সঙ্গে। ধারণাটা যদি সত্যি হয়, তা হলে বুঝতে হবে ওই লোক দু'টো এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। প্রি-পেড থেকে শিলিগুড়ির জন্যে ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছে, তা জেনেছিল। জেনে আগেভাগে শিলিগুড়ি চলে আসার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। শিলিগুড়ি থেকে তাদের অনুসরণ করে জলপাইগুড়িতে এসেছিল। জলপাইগুড়ির ডি এফ ও অফিস থেকে ওরা খবর পেয়েছিল যে, অর্জুনরা খুঁটিমারি জঙ্গলের বাংলোয় থাকবে। জেনে রওনা হয়ে জ্ঞান সিংহের ধাবায় খেয়েছিল। কিন্তু পর-পর এত ঘটনা বড্ড কাকতালীয় বলে মনে হচ্ছিল অর্জুনের। তা ছাড়া ওরা তাদের অনুসরণ করবে কেন? মেজর যে লুসিকে নিয়ে আসছেন, সেটা ওদের জানার কথা নয়। অর্জুনকে অনুসরণ করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। অর্জুন চুলে আঙুল বোলাল। এবং তখনই আবিষ্কার করল, তার মাথা একেবারে হাল্কা হয়ে গিয়েছে। সেই যন্ত্রণা উধাও।

জঙ্গলে রাত শেষ হওয়ার দৃশ্য অসাধারণ। যেন গহীন অন্ধকারের জাল কেউ যেন ছুড়েছিল পৃথিবীর উপর সেই সন্ধের মুখে, সূর্য ওঠার একঘণ্টা আগে থেকে সে ধীরে-ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে জাল। একটু-একটু করে ফরসা হচ্ছে আকাশ। গাছের পাতাদের নাচতে দেখা যাচ্ছে বাতাসে। রোদ নেই, সূর্য ওঠার আগে গম্ভীর ছায়ার চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে সামনের বাগান, লন, খুঁটিমারির জঙ্গল। কিন্তু জঙ্গলের গাছে-গাছে শুরু হয়ে গিয়েছে পাখিদের অর্কেস্ট্রা। ভোর হল, ভোর হল।

"গুড মর্নিং!" বলেই লুসি চমকে জঙ্গলের দিকে তাকালেন, "মাই গড!"

"পাখিরা আপনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।"

মাথা নাড়লেন লুসি, "না। এই হট্টগোল রেকর্ড করে কোনও লাভ হবে না। কোনও পাখিকেই আলাদা চেনা যাবে না। কিন্তু আপনি কি আর্লি রাইজার?"

"আমি? না তো।" তারপরেই খেয়াল হল, "ওঃ। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারপর আর ঘুম আসেনি।"

ঠিক তখনই চিৎকারটা শোনা গেল। অর্জুন কান খাড়া করেই বুঝতে পারল ওটা পদমবাহাদুরের গলা। সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বাংলোর পিছনে চলে এল। পদমবাহাদুর চিৎকার করে যাচ্ছে। চৌকিদার তার পাশে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়ির বনেট খোলা, সামনের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছে।

"কী হয়েছে?"

অর্জুনকে দেখে কয়েক পা এগিয়ে এল পদমবাহাদুর, "সাব, দেখুন গাড়ির কী অবস্থা করেছে! ভিতরের তার ছিঁড়েছে, চাকার হাওয়া বের করে দিয়েছে।"

চৌকিদার বলল, "এরকম ঘটনা এর আগে এখানে ঘটেনি সাব! রাতে বাইরের লোক এখানে আসে না।"

"বাইরের লোক আসে না!" পদমবাহাদুর খিঁচিয়ে উঠল, "তা হলে এসব কে করল?"

এই সময় মেজর এবং লুসি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। সব দেখে মেজর ঘুসি মারলেন গাড়ির দরজায়, "শুট করব, ক্ষতিপূরণ চাইব। হোয়্যার ইজ দ্যাট কেয়ারটেকার? কল হিম।"

চৌকিদার ছুটল। পদমবাহাদুর জানাল, শুধু তারগুলো জুড়ে ঠিকঠাক করতে এই বেলাটা কেটে যাবে। তার কাছে একটা স্টেপনি আছে। অথচ দু'টো চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে কোনও গ্যারাজ থেকে আর-একটা স্টেপনি ধার করে আনতে হবে। তারপর গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে খোলা চাকায় হাওয়া ভরতে হবে।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এসব কিছুই করতে হবে না। তুমি পিচরাস্তা থেকে একটা ভ্যান-রিকশা ডেকে এনে তাতে চাকা তুলে গয়েরকাটার গ্যারাজে নিয়ে যাও। সেখানে হাওয়া ভরার পর, একজন গাড়ির ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে এসো।"

পদমবাহাদুর চাকা খুলতে বসে গেল জ্যাক বের করে।

বাংলোর দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসে টি-পট থেকে কাপে চা ঢালছিলেন মেজর। এখন সোনা-সোনা রোদ্দুর চারপাশে। মেজর বললেন, "বুঝলে লুসি, কোনও একটা দুষ্টু ছেলে কাণ্ডটা করেছে। বাচ্চাদের মাথায় তো কত রকমের বুদ্ধি খেলা করে। সাধারণ ব্যাপার।"

লুসি চায়ের কাপ তুলে নিলেন, "আমরা কি এখানে আজকের দিনটা থাকব?"

"যদি তোমার কাজ না হয় তা হলে নিশ্চয়ই থাকব," মেজর বললেন।

অর্জুন ভাবছিল কী করে গত রাতের ঘটনাগুলো এঁদের জানাবে। ব্যাপারটা যে একেবারেই ছেলেমানুষি নয়, তা জানলে এঁরা নিশ্চয়ই বেশ আপসেট হয়ে পড়বেন। বিশেষ করে লুসির মতো ভদ্রমহিলা বিদেশে এসে বড় রকমের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে নিশ্চয়ই চাইবেন না।

চায়ে চুমুক দিয়ে লুসি অর্জুনের দিকে তাকালেন, "আমি ম্যাপে দেখলাম নর্থ বেঙ্গলের ফরেস্টের শুরু এখান থেকেই। তার মানে ওপাশে আরও গভীর জঙ্গল আছে। আমরা আজই সেরকম কোনও জঙ্গলে চলে যেতে পারি না?"

"নিশ্চয়ই পারি।"

"বেশ। কোথায় যাবেন ঠিক করে নিন। আর সারাদিন আমি যেন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারি, সেটা দেখবেন প্লিজ। বেশি প্রচার করে না যাওয়াই ভাল।" চা-টা শেষ করে লুসি উঠে চলে গেলেন তাঁর ঘরে। মেজর চায়ের কাপ হাতে সুর ভাঁজছিলেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...।"

অর্জুন তাকাল, "আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব?"

"শিওর," চায়ে চুমুক দিলেন মেজর।

"আমি ছাড়া এদেশে আপনাদের আসার কথা আর কেউ কি জানে?"

"ওদেশে অনেকেই জানে। বিষ্টু সাহেবকে বলে এসেছি। তিনি এখন কিছুটা সুস্থ। কিন্তু বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হবে শুনে এলেন না। লুসির গবেষণার ব্যাপারটা যাঁরা স্পনসর করছেন তাঁরা জানেন। আর এদেশে দু'জন জানেন।"

"কারা?"

"তোমার মা আর অমল সোম।"

"অমলদার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে?"

"হ্যাঁ। কথা হয় না। মাঝে-মাঝে ইন্টারনেটে পত্র বিনিময় হয়।"

"কিন্তু মেজর, আমার বিশ্বাস আপনাদের উপর নজরদারি করতে কেউ বা কারা বেশ সক্রিয়। দু'জন গত রাতে এই বাংলোয় এসেছিল। তারাই যাওয়ার সময় গাড়িটার অবস্থা ওই রকম করে গিয়েছে," অর্জুন বলল।

হাঁ হয়ে গেলেন মেজর, "মাই গড। লোক দু'টো এখানে এল কী করে?"

"সুমো গাড়িতে চেপে।"

"তুমি দেখলে ওরা গাড়িটাকে নষ্ট করছে আর চুপ করে থাকলে?"

"খালি হাতে কিছু করতে যাওয়া বোকামি হত।"

"কখন এসেছিল?"

"রাত আড়াইটের পর।"

"তখন তুমি জেগেছিলে? ঘুমোওনি?"

"ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

"আশ্চর্য! আমাকে ডাকলে না কেন?" মেজর বিরক্ত।

boiRboi.net

"ওদের কাছে অস্ত্র ছিল। কিছুই করা যেত না। তা ছাড়া আপনি যেরকম গভীর ঘুমে ডুবেছিলেন, তাতে সহজে ওঠানো যেত না," অর্জুন বলল।

"কিন্তু, কিন্তু লোক দু'টো কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল?"

"ওদের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। বোধ হয় জেগে আছি দেখে আর এখানে দাঁড়াতে চায়নি। লোক দু'টো নর্থ বেঙ্গলের। এখানকার সব কিছু জানে। হয়তো কেউ ওদের রিক্রুট করেছে," অর্জুন বলল। "লুসিকে এসব কথা না বলাই ভাল।"

মেজর ভাবলেন, "এমন তো হতে পারে, কে বা কারা পছন্দ করছে না, লুসি এই গবেষণা করুন। ওঁর সঙ্গে কথা বললে জানা যেত আমেরিকায় এরকম কেউ আছে কিনা।" মেজর তাকালেন।

"তা যদি হয়েও থাকে, তা হলে তারা নর্থ বেঙ্গলের লোককে রিক্রুট করবে কী করে? বড্ড অস্বাভাবিক বলে কি মনে হচ্ছে না আপনার?"

মেজর মাথা নাড়লেন। একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "একটা কথা বলি। কাল রাত্রে তুমি এসব স্বপ্নে দ্যাখোনি তো?"

"তার মানে? স্বপ্ন দেখলাম আর সেইমতো গাড়িটাকে ওই অবস্থায় সকালে পাওয়া গেল?" অর্জুন বেশ জোরে বলে ফেলল।

এই সময় লুসি এলেন। পরনে জিন্স, টপ, পায়ে জঙ্গলে ঘোরার উপযোগী জুতো, কাঁধে বড় ব্যাগ। "আমি তৈরি।"

"এখনই বেরোবে? ব্রেকফাস্ট খেয়ে গেলে হত না?" মেজর বললেন।

"না, না। তখন রোদ আরও কড়া হয়ে যাবে।"

মিনিটপাঁচেকের মধ্যে ওরা বাংলো ছেড়ে পিছনের পথ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে মেজরকে তৈরি হতে দেখে ভাল লাগল অর্জুনের। বয়স হওয়া সত্ত্বেও বার্ধক্য ওঁকে গ্রাস করেনি।

প্রথম দিকের জঙ্গল বেশ ফাঁকা। পুরনো গাছ কেটে নতুন যে গাছগুলো লাগানো হয়েছিল, তাদের শৈশব অবস্থা কাটেনি। কিন্তু পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে খুব। বিশেষ করে 'বউ কথা কও' বলে পাখিটা জঙ্গল কাঁপিয়ে দিচ্ছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি এই পাখির ডাক আগে শুনেছেন?"

"না। কী পাখি ওটা?"

"এখানে বলা হয় 'বউ কথা কও'।"

"বউ...!" থেমে গেলেন লুসি।

অর্জুন হেসে ফেলল, "এর ইংরেজি অনেকটা এই রকম, ব্রাইড, সে সামথিং।"

"ইজ ইট?" লুসি প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন একটা গাছের তলায়। তারপর ব্যাগ থেকে টেপ রেকর্ডার বের করে চাপা গলায় কিছু বলে যন্ত্রটাকে উঁচু করে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ডাকটা থেমে গেল। মিনিটদুয়েক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকেও আর পাখিটাকে ডাকতে শুনল না ওরা।

ফিরে এসে লুসি বললেন, "এখন থেকে কেউ আর কথা বলব না এবং জুতোয় যাতে শব্দ না হয় সেটা খেয়াল রাখব। কেমন?"

একটু পরেই জঙ্গল গভীর হলেও পায়ে চলা পথ ধরে এগোতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আচমকা একটা পাখির ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন লুসি। পাখিটা উঁচু হয়ে চলে গেল জঙ্গলের আরও ভিতরে। টিপ টিপ টিসুম। টিপ টিপ টিসুম! লুসি ডাকটা রেকর্ড করছিলেন।

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। এখন মেজরের মাথায় টুপি। আর সেই টুপির উপর একটা কালো জোঁক নৃত্য করছে। বললেই মেজর এমন চিৎকার করে উঠবেন যে, জঙ্গলের সব পাখি উড়ে পালাবে। সে ইশারায় মেজরের কাছ থেকে টুপিটা দেখতে চাইল। খুব গর্বিত হাসি হেসে মেজর টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে অর্জুনের হাতে দিলেন। অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে জোঁকটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু ওর পড়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। ততক্ষণে জোঁকটাকে দেখতে পেয়ে মেজর দু' হাতে নিজের মুখ চেপে ধরেছেন প্রবল শক্তিতে। মাটিতে টুপি নামিয়ে একটা কাঠির সাহায্যে জোঁকটাকে টুপি থেকে নামাতে পারল অর্জুন। জুতোয় পিষে ওটাকে মারতে চাওয়া অর্থহীন। তবু মেজর সেই চেষ্টা করে ক্ষান্ত হলেন।

বেলা এগারোটায় ওরা একটা ঝরনার সামনে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে লুসি গোটাদুয়েক ক্যাসেট পরিবর্তন করেছেন।

মেজর বললেন, "লুসি, এবেলার জন্য অনেক হয়েছে। এবার ফেরা যাক।"

লুসিকে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। তিনি প্রথম ক্যাসেটটা বের করে রেকর্ডারে ঢুকিয়ে বললেন, "একটু চেক করে নিই, সাউন্ড ঠিক আছে কিনা।"

লুসি ক্যাসেট রি-ওয়াইন্ড করছিলেন। অর্জুন ঝরনার দিকে তাকাল। একটা বেশ বড়সড় পাথরঠোকা মাছ প্রায় হাতের নাগালে এসে পাক খেয়ে চলে গেল। এই ঝরনায় মাছ আছে। আর এই মাছেরা নীচের দিকে যায় না! মেছুয়া পুলের নীচের ঝরনায় এদের তো একসময় দেখা যেত।

হঠাৎ শব্দ হল। অর্জুন ঝরনার ওপাশে তাকাতেই চমকে উঠল। জঙ্গল ফুঁড়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিশাল চেহারার দাঁতাল হাতি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ করছে। ঝরনাটা চওড়ায় বড়জোর কুড়ি ফুট।

"মাই গড!" মেজরের গলা দিয়ে বেরনো স্বরটাকে ঠিক বোঝা গেল না মেজরের বলে। ঠিক সেই সময় রি-ওয়াইন্ড সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্লে-বোতাম টিপে উঠে দাঁড়ালেন লুসি, "মেজরের জন্যে একটা সারপ্রাইজ প্রথমে বাজবে।"

দাঁড়িয়ে থেকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মরার কোনও মানে হয় না। অর্জুন ফিসফিস করে বলল, "দৌড়োন।"

সে ঘুরে দাঁড়াতেই মেজর তাকে অনুসরণ করলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভয়ংকর আওয়াজ শোনা গেল। সেই সঙ্গে লুসির আর্তনাদ। মেজর অর্জুনের হাত ধরে টেনে থামালেন, "শুনতে পাচ্ছ? এটা নিশ্চয়ই বাঘ। নিশ্চয়ই জন্তুটা লুসির উপরে ঝাঁপিয়েছে। হাতির ভয়ে পালালাম আমরা অথচ মেয়েটাকে ছেড়ে এলাম বাঘের পেটে যাওয়ার জন্য। কী জবাব দেব? কী জবাব দেব আমি ওর বাবা-মা'কে?" মেজর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অর্জুনের কানে এল গাছপালা ভাঙার শব্দের সঙ্গে বন্য জন্তুর হুঙ্কার মেশা বিচিত্র আওয়াজ। সে দেখল, মেজর হাত মুঠো করে হাঁটছেন ঝরনার দিকে। অর্জুন মেজরের সঙ্গ নিতেই হুঙ্কার থেমে গেল। মেজর ফিসফিসিয়ে বললেন, "বাঘটা বোধ হয় চলে গেল। কিন্তু হাতিটা তো ওখানে আছে!"

"বাঘে-হাতিতে একসঙ্গে ঝরনার জল খায় না।"

"আঃ, তুমি এই সময়ও রসিকতা করছ?"

জঙ্গল সরিয়ে ঝরনা দেখে ওপারে তাকাল অর্জুন। হাতিটাকে দেখা যাচ্ছে না। প্রাণীটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই জায়গার গাছপালার উপর যেন তাণ্ডব বয়ে গিয়েছে। মুখ ফেরাতে সে লুসিকে দেখতে পেল। উবু হয়ে বসে টেপ রেকর্ডারে কিছু করছেন। মেজরকে সেটা দেখাতেই তিনি হাত উঁচু করে চিৎকার করতে-করতে ছুটলেন। "ও লুসি, মাই লিট্‌ল ডিয়ার, তোমার কিছু হয়নি তো? হাতি বা বাঘ তোমাকে আহত করেনি দেখে আমি যে কী খুশি হয়েছি!"

লুসি অবাক হলেন, "বাঘ? এখানে বাঘ কখন এল? একটা হাতিকেই তো দেখলাম।"

লুসির কথা শোনামাত্র অর্জুনের মনে পড়ে গেল। বাঘের ব্যাপারটা

boiRboi.com

স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে। সে লুসিকে বলল, "আওয়াজটা মেজরকে শোনান।"

লুসি হেসে প্লে-বোতাম টিপবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গর্জন শুরু হল।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এই আওয়াজ কোথায় রেকর্ড করলে? এ তো বাঘ কিংবা সিংহের গর্জন। একবার আফ্রিকায়...।"

"কাল রাতে অর্জুন ডেকে শোনালে আমি রেকর্ড করেছিলাম। এই আওয়াজ তোমার নাক থেকে বেরিয়েছে মেজর," লুসি হাসলেন।

মেজর এমন হকচকিয়ে গেলেন যে, দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ঢেকে থাকা মুখেও লজ্জা-লজ্জা ভাব ফুটে উঠল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "হাতিটা এপারে আসেনি?"

"আপনারা চলে যেতে আমি কী করব বুঝতে না-বুঝতেই হাতি জলে পা রেখেছিল এপারে আসবে বলে। ঠিক তখনই টেপ রেকর্ডার থেকে মেজরের নাক ডাকার শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। প্লে-বোতাম টেপার পর কয়েক সেকেন্ড গ্যাপ ছিল হয়তো। আমি ভয় পেয়ে ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই আওয়াজ কানে যেতেই হাতি থমকে দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো দৌড়তে লাগল পিছন ফিরে। গাছগুলো ভাঙল কিন্তু ওর সেদিকে খেয়াল ছিল না। এমন প্রাণভয়ে পালাতে আমি আজ পর্যন্ত কোনও জন্তুকে দেখিনি," লুসি এগিয়ে এসে মেজরের হাত ধরলেন, "তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব মেজর, জানি না। তুমি আজ আমার জীবন রক্ষা করেছ। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।"

মেজর ততক্ষণে স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন, "এ এমন কিছু নয়। আমি কী নাক ডাকি! তোমরা তো মারিয়ার নাক ডাকা শোনোনি।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মারিয়া কে?"

"উগান্ডায় আমার যে গাইড ছিল। লিকলিকে রোগা, পাঁচ তিন লম্বা। মাথা ন্যাড়া রাখতে ভালবাসে। ও যখন রাতে নাক ডাকে তখন পৃথিবী কাঁপতে থাকে। ভয়ংকর র‍্যাটল স্নেকরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। হাতি তো তার কাছে কিছু নয়। কিন্তু মাই ডিয়ার লুসি, এবার তোমার যন্ত্রটাকে বন্ধ করবে?" মেজর বললেন।

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। বন্ধ করুন। তাকিয়ে দেখুন, ঝরনার মাছগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে এখান থেকে। কোনও গাছে পাখি ডাকছে না।"

মেজর বললেন, "আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারি তা জানো? অনুমতি ছাড়া আমার ব্যক্তিগত শব্দ চুরি করেছ! এবার ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ, ওই শব্দ লুসির প্রাণ বাঁচিয়েছে। এখন চলো, হাঁটা যাক।"

গোটা দুপুর লুসি তাঁর ঘরে টেপ রেকর্ডার নিয়ে কাটালেন। আজ যত পাখির ডাক তিনি রেকর্ড করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে একটা ডায়েরিতে মন্তব্য লিখে রাখছিলেন। অর্জুনকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন সাহায্য করবার জন্যে। লাঞ্চের পর যখন মেজর একটু বিছানায় গড়াতে গেলেন, তখন অর্জুন এসেছিল লুসির ঘরে। এখন লুসির পরনে হাঁটুর তিন ইঞ্চি নীচে নামা প্যান্ট আর গেঞ্জি। খাটের উপর রেকর্ডার এবং ডায়েরি নিয়ে বাবু হয়ে বসে কাজ করছেন। কোনও-কোনও বাঙালি মেয়ে হয়তো এরকম পোশাকে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারে, কিন্তু এখনও তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। লুসি যে কাজপাগল মানুষ তাতে সন্দেহ নেই।

রেকর্ডারের স্টপ বোতাম টিপে লুসি তাকালেন, "পাখিদের সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে আপনার? পাখিদের পৃথিবীটা কীরকম জানেন?"

মাথা নাড়ল অর্জুন, "জানি না।"

লুসি যেন ছাত্র পেয়ে খুশি হলেন, "১৮৫৭ সালে পি এল স্কাটার নামে এক ভদ্রলোক পাখিদের পৃথিবীটাকে ভাগ করেছেন ছ' ভাগে। এক, নিয়ার্কটিক, উত্তর আমেরিকা এবং মধ্য মেক্সিকো। দুই, নিউ ট্রপিক্যাল, মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা। তিন, প্যালিয়ার্টিক, ইউরোপ, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অংশ, এশিয়ার পশ্চিমাংশ। চার, ইথিওপিয়ান, আফ্রিকার অধিকাংশ এবং আরব দেশ। পাঁচ, ওরিয়েন্টাল, ভারত, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর ছয়, অস্ট্রেলিয়ান, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজ্যালান্ডের আকাশে যেসব পাখিদের দেখা যায়। কিন্তু এর ৩৫ বছর পর ক্রিস্টন হার্ট মেরিয়াম বললেন, ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী পাখিদের ভাগ করা খুব ভুল হবে। তিনি বললেন, টেম্পারেচার এবং হিউমিডিটি অনুযায়ী পাখিদের চরিত্র তৈরি হয়।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এটাই তো সহজ। শীতের পাখি, গরমের পাখি। আপনাদের আমেরিকায় কত পাখি আছে তার গণনাও কি করা হয়েছে?"

"জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে সামারের শুরুতে প্রায় ছয় মিলিয়ন পাখি আমেরিকায় থাকে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রতি একর জমিতে প্রায় তিনটি পাখি। এই হিসেবটা খুব কাছাকাছি। আপনাদের এখানে পাখির সংখ্যা কি গোনা হয়েছে?" লুসি জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। প্রায়ই শোনে, হাতি, গন্ডার বা বাঘ গোনা হচ্ছে। কিন্তু পাখি গোনার কথা কানে আসেনি। সে মাথা নেড়ে না বলল।

লুসি টেপটা চালু করতেই কাঠঠোকরার আওয়াজ কানে এল। অর্জুন নামটা বলতেই লুসি বললেন, "উডপোকার। ট্রপিক্যাল দেশগুলোতে প্রচুর দেখা যায়।"

হঠাৎ কানে এল একটা ডাক। বিপ বিপ বিপ। তারপর একটু শিস। লুসি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই পাখির নাম কী?"

"না, আমি কখনও শুনিনি।"

"কোনও পক্ষীবিশারদের নাম জানা আছে?"

সলিম আলির নাম মনে পড়ল অর্জুনের। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন কিনা, তা তার জানা নেই। আর-একজন, লেখক বুদ্ধদেব গুহ। ওঁর নানা লেখায় বিচিত্র সব পাখির ডাক পাওয়া যায়।

লুসি বোধ হয় আন্দাজ করলেন। বললেন, "এই পাখির ডাক আমার আরও দরকার।"

ওঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিশাল গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন।

"আপনাদের ওখানকার কোনও পরিচিত পাখির ডাকের সঙ্গে মিল পাচ্ছেন বুঝি?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করতে লুসি মাথা নাড়লেন, "নো।" তারপর আবার রি-ওয়াইন্ড করে ডাকটা শোনালেন। বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, "শোনার পর কি কিছু মনে আসছে?"

বিপ বিপ বিপ। শিসের আওয়াজ। শিসের আওয়াজ খুব স্পষ্ট রেকর্ড হয়নি। অর্জুন চোখ বন্ধ করল। বিপ বিপ বিপ। টেলিফোনের নম্বর ঘোরানোর পর অনেক সময় লাইনটা পাওয়ার আগে বিপ বিপ বিপ শব্দ শোনা যায়। নির্দিষ্ট নম্বরে পৌঁছবার প্রয়াস চালিয়ে যায়।

অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

"চলুন, বেরিয়ে পড়ি। পাখিটাকে লোকেট করতেই হবে।"

"কেন?"

"ওর ডাকটাকে ব্যবহার করা যায়।" লুসি নেমে পড়লেন।

অর্জুন ঘড়ি দেখল, "এখন জঙ্গলে গেলে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। আমাদের তো আজই এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা।" অর্জুন বলল।

"কিন্তু আমার যে ওই পাখিটাকে দরকার।"

"আপনি পাবেন। এই বুটিমারিতে যত পাখি আছে, তার সবটাই পাওয়া যাবে গোরুমারায়, চাপড়ামারি অথবা জলদাপাড়ায়।"

"যদি না পাওয়া যায়?"

boiRboi.net

"তা হলে এখানে ফিরে আসব। এমন কিছু দূরত্ব নয়," অর্জুন আশ্বস্ত করল তাঁকে। গুছিয়ে নেওয়ার জন্য দশ মিনিট সময় দিয়ে অর্জুন নিজেদের ঘরে ঢুকে দেখল, মেজর ডায়েরি লিখছেন। তাঁকেও তৈরি হতে বলে মোবাইলটা অন করল অর্জুন। বাঃ, এই মুহূর্তে নেটওয়ার্ক আছে। সে জলপাইগুড়ির বাড়ির ল্যান্ডলাইন ধরবার জন্যে বোতাম টিপতেই শুনতে পেল, বিপ বিপ বিপ। তারপর স্ক্রিন সাদা, নেটওয়ার্ক চলে গেল। অবিকল ওই পাখির ডাক!

গাড়ি সারানো হয়ে গিয়েছিল। লুসি বসলেন ড্রাইভারের পাশে, ওরা পিছনে। অর্জুন লক্ষ করছিল কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। সে ঠিক করল, গয়েরকাটার চৌমাথা দিয়ে জলদাপাড়ায় যাবে না। ড্রাইভারকে বলল, "পদমবাহাদুর, তুমি হিন্দুপাড়া দিয়ে বিনাগুড়ির রাস্তাটা চেনো?"

"জি সাব।"

"ওই রাস্তায় চলো।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে শর্টকাট পথ ধরে ওরা বিনাগুড়ির দিকে ছুটতে লাগল। একটু তরল গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন, "পদমবাহাদুর, কাল রাত্রে যারা গাড়ির ক্ষতি করেছে, তাদের খবর পেলে?"

"বদমাশরা বেঁচে গিয়েছে!"

"মানে?"

"কাল রাতে, ভোর রাতে, একটা সুমো গাড়ি নাথুয়ার দিক থেকে এসে গয়েরকাটার তিনমোড়ে গাছের গায়ে ধাক্কা মারে। তখন সবাই ঘুমোচ্ছিল। শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দ্যাখে, গাড়িটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ড্রাইভার বা কেউ নেই। দুপুরে আমার গাড়ি নিয়ে ফেরবার সময় দেখলাম, পুলিশ এসে গিয়েছে। শুনলাম, ওই সুমোটা নাকি গতকালই চুরি হয়ে গিয়েছিল শিলিগুড়ি থেকে।"

"অদ্ভুত ব্যাপার। এরা গাড়ি চালালেই অ্যাক্সিডেন্ট করে নাকি! কিন্তু অত ভোরে এই গয়েরকাটার মতো নির্জন জায়গা পেরিয়ে গিয়ে লুকোবে কোথায়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

পদমবাহাদুর মাথা নাড়ল, "কোনও ট্রাক ধরে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

সেটা অস্বাভাবিক নয়। জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতি মিনিটে ট্রাক যাওয়া-আসা করে অসম থেকে। তার একটাকে থামিয়ে উঠে পড়লেই হল।

গয়েরকাটা ছাড়িয়ে বীরপাড়া হয়ে মাদারিহাটের দিকে ছুটে যাচ্ছিল গাড়ি। অর্জুন দেখল, রাস্তার দু'পাশে জঙ্গল কেটে বসতি তৈরি হয়ে গিয়েছে বীরপাড়া পর্যন্ত। মাদারিহাটে যখন তাঁরা পৌঁছোল তখন ঘন বিকেল। আর-একটু এগিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে টুরিস্ট বাংলো। বাংলোয় গিয়ে পরিচয় দেওয়ার আগেই কেয়ারটেকার বললেন, "নমস্কার অর্জুনবাবু।"

অর্জুন বলল, "নমস্কার। আমরা কাল রাতে ছিলাম খুঁটিমারির বাংলোয়। জলপাইগুড়ির ডি এফ ও অনুমতি দিয়েছিলেন। এই ভদ্রমহিলার শখ পাখির ডাক রেকর্ড করা। তা আমাকে বলা হয়েছে, জলদাপাড়া কোচবিহারের ডি এফ ও-র এলাকা। আপনাদের বাংলোয় নিশ্চয়ই জায়গা নেই। কোনও প্রাইভেট থাকার ব্যবস্থা আছে?"

ভদ্রলোক হাসলেন, "তার আর দরকার হবে না। একটু আগে হলং বাংলোটা খালি হয়েছে। কলকাতার এক পার্টি চারদিনের জন্যে বুক করেছিল। ওরা গতকাল এসেছিল, কিন্তু আজই একটা খারাপ খবর পেয়ে ফিরে গিয়েছে কলকাতায়। এ ক্ষেত্রে তিনটে রাত বাংলো খালি থাকছে। আপনারা স্বচ্ছন্দে তিনরাত ওখানে থাকতে পারেন।"

"বাংলোটা কোথায়?"

"একেবারে জলদাপাড়া ফরেস্টের ঠিক মাঝখানে। আপনারা চলে যান, আমি ওখানকার রেঞ্জারকে ফোনে বলে দিচ্ছি।"

ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠল অর্জুন। ঢোকার মুখে পাহারাদারের চৌকি, গেট বন্ধ। সেখানে পরিচয়পত্র দেখালে, লেখালেখির পর গেট খুলে দেয়। যেহেতু ওরা কেয়ারটেকারের কাছ থেকে আসছে, তাই কোনও সমস্যা হল না।

মেজর এতক্ষণে মুখ খুললেন, "আচ্ছা অর্জুন, তুমি জানতে ফরেস্টের কোনও বাংলোয় জায়গা নেই। শুধু খুঁটিমারিই আমাদের ভরসা ছিল। তা হলে কোন সাহসে সেই বাংলো ছেড়ে এদিকে এসেছিলে! কিছু না পেলে তো আবার ফিরে যেতে হত!"

"না, যেতাম না। এখান থেকে ফুন্টশোলিং ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। ওখানে চলে যেতাম। বিদেশ ঘোরাও হয়ে যেত।" অর্জুন হাসল।

জঙ্গলের মধ্যে চমৎকার রাস্তা। অর্জুন বলল, "এই জঙ্গলে গন্ডার, বাইসন এবং হাতি যে-কোনও মুহূর্তে দেখলে অবাক হবেন না।"

কথাটা সে বলেছিল ইংরেজিতে। লুসি কাঁধ নাচালেন, "আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড। এর মধ্যে বুঝতে পেরেছি, প্রচুর পাখি আছে এখানে।"

রেঞ্জার সাদরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে অর্জুনকে বললেন, "আপনি কি এবার কোনও অভিযানে এসেছেন? তা হলে আমাকে সঙ্গে নেবেন।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এবার এসেছি পাখির ডাক শুনতে। উনি ওই নিয়ে গবেষণা করছেন। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।"

রেঞ্জার বললেন, "কিছুটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝিল তৈরি করা হয়েছে। প্রচুর পাখি হয় শীতকালে। এখনও কিছু আছে। গিয়ে দেখতে পারেন।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে আপনাদের সমস্যা কী কী?"

"মূল সমস্যা দু'টো। চোরা-কাঠকারবারি আর গন্ডারশিকারি। তবে আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে।"

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। জঙ্গলের উপর ঘন ছায়া। লুসি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "রাতে এই জঙ্গলের ভিতর ঢোকা কি নিরাপদ নয়?"

"না। বিশেষ করে বাইসন বা হাতির সামনে পড়লে ফিরে আসতে পারবেন না," রেঞ্জার বললেন। "সবচেয়ে ভাল সময় ভোর সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা। প্রচুর পাখির ডাক শুনতে পাবেন সে সময়।"

হলং বাংলোটি চমৎকার। বোঝাই যায় মন্ত্রী বা বড় আমলারা ওখানে মাঝেমধ্যে ওঠেন। তিনটে খালি ঘর পাওয়ায় সুবিধে হয়েছিল। রাত দশটায় জেনারেটর বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন হারিকেনের আলো ভরসা। তার আগে খেয়ে নিতে হবে। নিজের ঘরে বসে অর্জুন মোবাইলে গেম খেলছিল। হঠাৎ মেজর ঢুকলেন বেশ উত্তেজিত হয়ে, "কাম, ভিতরে এসো। পাজি, নচ্ছার।"

অর্জুন উঠে দাড়িয়ে দেখল, একটি রোগা মানুষ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হাতজোড় করে। ভয়ে কাঁপছে বেচারা। মেজর বললেন, "কী আস্পর্ধা, আমার ঘরে মশারি টাঙাতে আসে একপেট হুইস্কি খেয়ে! আবার যতবার জিজ্ঞেস করছি ডিউটিতে থাকার সময় কেন হুইস্কি খেয়েছ, ততবারই বলছে খায়নি। লায়ার। ওর শাস্তি হওয়া উচিত।"

অর্জুন তাকাল লোকটার দিকে। লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "আমি হুইস্কি খাইনি সাহেব।"

"আবার মিথ্যে কথা! সারাজীবন ওটা খেয়ে এসেছি, আমি জানি না ওরকম নেশা কী খেলে হয়! তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর এ ব্যাপারে আস্থা রাখবে অর্জুন।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। হুইস্কি কিনে খাওয়া ওর পক্ষে তো অসম্ভব ব্যাপার। তা হলে ও খেল কোথায়?" অর্জুন বলল।

"সেটা ব্যাপার। কোনও গেস্টের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে।"

"আমার তা মনে হয় না। এই জঙ্গলের গভীরে, ও জিনিস যারা পছন্দ করে তারা টাকা দিতে পারে, কিন্তু নেশার বস্তু দান করবে না।" অর্জুন এগিয়ে গেল, "বুঝলাম, তুমি সত্যি কথা বলছ, হুইস্কি খাওনি।"

এতক্ষণে লোকটার মুখে হাসি ফুটল, "হ্যাঁ সাহেব, হুইস্কি খাইনি।"

"কিন্তু কিছু একটা খেয়ে নেশা করেছ। কী সেটা?"

"হাঁড়িয়া। আমরা যে হাঁড়িয়া খাই, তা সবাই জানে।"

"হাঁড়িয়া?" মেজর একপা এগিয়ে এলেন, "হোয়াট্স দ্যাট?"

"কান্ট্রি লিকার। ওরা বাড়িতে বানিয়ে খায়। অনেকটা বিয়ারের মতো।"

"মাই গড। সেটার এফেক্ট একেবারে হুইস্কির মতো?"

"তা আমি বলতে পারব না।"

"কিন্তু জিনিসটা আমি দেখতে চাই।"

অর্জুন পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরল। "এতে এক বোতল হাঁড়িয়া পাওয়া যাবে?"

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল। অর্জুন বলল, "যাও, নিয়ে এসো। এই সাহেবকে দেখাবার পর কাজ শেষ হয়ে গেলে তুমি খেয়ে নিও।"

লোকটা তৎক্ষণাৎ টাকা হাতে নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। মেজর মাথা নাড়লেন, "না, অর্জুন একটা মিথ্যেবাদীকে তুমি প্রশ্রয় দিলে!"

"বোধ হয় না। এখন বলুন, এখানে কেমন লাগছে আপনার?"

"দারুণ। তবে আফ্রিকার জঙ্গলের মতো রহস্যময় নয়।"

"তা হলে আসুন, আমরা আজকের রাতটা জেগে দেখি, রহস্য কিছু আছে কিনা!"

মেজরের চোখ ছোট হল, "বলছ? একটা রাত তো জেগে থাকাই যায়। লুসিকেও বলি।"

"না, না। ওঁকে রেস্ট নিতে দিন। কাল সকালে ওঁর তো অনেক কাজ।" অর্জুন আপত্তি করল। এই সময় তার মোবাইলে আলো জ্বলে উঠল। কেউ ফোন করেছে মনে করে ওটা তুলতেই আলো নিভে গেল। অর্জুন দেখল নেটওয়ার্ক আছে। কিন্তু ফোন এলে তো রিং হত।

মেজর বললেন, "ওই বস্তুটি খুব বিরক্তিকর। তোমার প্রাইভেসি বলে কিছু থাকবে না। যেখানেই যাও, লোকে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। আমেরিকার রাস্তায় প্রতি তিনজনের দু'জনে বিড়বিড় করতে-করতে হাঁটে। আজকাল তো কানে ফোন চেপে রাখতে হচ্ছে না, রিমোটে শুনতে পাচ্ছে।"

অর্জুন বলল, "এটা নেওয়ায় মা খুব খুশি। যখন ইচ্ছে আমার খবর পাবেন। অথচ গতকাল থেকে তিনি একবারও ফোন করেননি!"

এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন বলল "কে?"

সেই লোকটি সসংকোচে ঘরে ঢুকল। হাতে ছোট বোতল।

অর্জুন মেজরকে বলল, "নিন, পরীক্ষা করে দেখুন।"

মেজর খপ করে বোতলটা ধরে উপরে খুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলেন। নাকের নীচে নিয়ে এসে গন্ধ শুঁকলেন, "কী দুর্গন্ধ!"

"ভাত পচিয়ে ওরা ওই তরল পদার্থ তৈরি করে, যাকে আপনি দামি হুইস্কি ভেবে ভুল করছিলেন।" অর্জুন বলল।

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ভাই। যা বলছ, তাতে বুঝতে পারছি এটা খুব সস্তার জিনিস। তা হলে দামি জিনিসের সমান এফেক্ট কী করে হবে। আর যদি হয়, তা হলে আন্তর্জাতিক মদ্যপায়ী অ্যাসোসিয়েশনের নজরে আনা উচিত। হয়তো দেখবে লক্ষ-লক্ষ লিটার হাঁড়িয়া বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। গন্ধটা যদি কোনওভাবে কমানো যায় তা হলে...। অবশ্য এফেক্ট একই থাকবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে," মেজর বোতলটাকে ভাল করে দেখলেন আবার, "কোনও নাম লেখা নেই। তার মানে নেহাতই দিশি।"

অর্জুন বলল, "আপনি তো বিয়ার-হুইস্কি-রাম এ জীবনে আর মুখে তুলবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। খুব ভাল সিদ্ধান্ত। কিন্তু টি-টেস্টারের মতো হাঁড়িয়া-টেস্টার হবেন না, এমন প্রতিজ্ঞা কি করেছেন?"

"না, তা অবশ্য করিনি," বলে লোকটির দিকে তাকালেন। "ঠিক হ্যায়, তুমি যেতে পার। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

লোকটা চলে গেল। হঠাৎ খেয়াল হল মেজরের, "ইস, লুসি অনেকক্ষণ একা আছে। যাই, ওর খবর নিয়ে আসি। আমি আজ ঘরেই ডিনার খেয়ে নেব, বুঝলে? বেশ টায়ার্ড। গুড নাইট।"

রাত তখন একটা। হলং ফরেস্ট নিস্তব্ধ। মাঝে-মাঝে জঙ্গল থেকে অদ্ভুত সব প্রাণীর চিৎকার ভেসে আসছে। অর্জুন জানলার পাশের চেয়ারে বসে অলস চোখে অন্ধকার দেখছিল। একটু ঝিমুনি আসছে। কোনও কারণ নেই, তবু সে স্থির করেছিল রাতে ঘুমাবে না। 'দিনে ঘুমোও, রাতে জাগো', নির্দেশটা না হয় আজ পালন করবে। এই সময় অন্ধকারকে একটু নড়তেচড়তে দেখে সে সোজা হয়ে বসল। তারপর বুঝল, গেটের বাইরে হাতির দল দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তাদের চেহারা অস্পষ্ট। তবু, এক-দুই করে গোটাছয়েকের শরীরের আভাস পেল অর্জুন। শেষ পর্যন্ত দলটা চলে গেল বাঁদিকে। অর্জুনের মনে প্রশ্ন এল, ওরা কখন ঘুমোয়?

রাত গড়াচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে মোবাইলের আলো দপদপ করে উঠতেই চমকে তাকাল অর্জুন। কোনও রিং হচ্ছে না। মোবাইলের স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে, প্রাইভেট নম্বর। আর তখনই মাথার ভিতরে অদ্ভুত অস্বস্তি শুরু হল। স্পষ্ট কানে এল, বিপ, বিপ, বিপ...? তিনবার ওই একটানা শব্দের পর গলার স্বর কানে এল, "হ্যালো, হ্যালো অর্জুন! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো অর্জুন?"

"পাচ্ছি। আপনি কে?" ফিসফিস শব্দে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"আমি, আমি। শোনো, ওই মেয়েটির দিকে নজর রেখো। সাবধান। মেয়েটি খুব বিপদের মধ্যে আছে, যা ওর জানা নেই। হ্যালো হ্যালো...!" যেভাবে টেলিফোনের লাইন কেটে যায় তেমনভাবে কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। আর সেটা হওয়ামাত্র মাথা ধরে গেল অর্জুনের। কপালের দু'পাশের শিরা দপদপ করতে লাগল। সে মোবাইল তুলে দেখল, আলো নিভে গিয়েছে। কল রিসিভড্-এ লেখা হয়েছে, 'আ প্রাইভেট নম্বর।'

এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। হারিকেনের আলো ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে দরজা খুলল অর্জুন। মেজর দাঁড়িয়ে আছেন, "ওটা হুইস্কির বাবা, বুঝলে।" কথা জড়ানো।

"আপনি পুরোটা খেয়ে নিলেন?" অর্জুন অবাক।

"না খেলে বুঝব কী করে? আমার খুব নেশা হয়ে গিয়েছিল।"

"কী করে বুঝলেন?"

"বুঝব না? হঠাৎ মনে হল, কে যেন জানলা দিয়ে একটা বড় জবাফুলের মালা ছুড়ে দিল আমার গলায়। আশ্চর্য, উঠতে না-উঠতে মালাটা ভ্যানিশ হয়ে গেল। বুঝতে পারছ, কী বিপুল নেশা! এরকম আমার কখনও হয়নি। তাই তোমাকে না জানিয়ে পারলাম না," মেজর আবার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

অর্জুন বাধা দিল, "মেজর!"

"ইয়েস মাই বয়!"

"আমি একটা বইয়ে পড়েছি, যারা বুঝতে পারে তাদের নেশা হয়ে গিয়েছে, তাদের মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে যায় না। আপনার হয়নি, দাঁড়ান।" নিজের ঘর বন্ধ করে সে মেজরকে নিয়ে ওঁর ঘরে ঢুকল। হারিকেনের আলো টিমটিম করছে। সেটাকে বাড়াল।

হেসে জিজ্ঞেস করল, "জবাফুলের মালা ওই জানলা দিয়ে কেউ ছুড়েছিল?"

"ইয়েস," মাথা নাড়লেন মেজর।

"আপনার কী করে মনে হল ওটা জবার মালা, গাঁদাও তো হতে

BanglaBook.org

পারে।"

"নো, রেডিশ, লালচে।"

"বাব্বা! আপনার রংও খেয়াল আছে।"

"অ্যাজ বিকজ আমার নেশা হয়নি," মেজর টলছিলেন।

"এই জন্য বলে, অনভ্যাসের চন্দন কপালে চড়চড় করে।"

"তার মানে?"

"অনেকদিন পরে খেলেন তো! অভ্যেস চলে গিয়েছে।" বোতলটা তুলে ভাল করে দেখল অর্জুন। এক বিন্দুও তলানি নেই।

"ঘুম পাচ্ছে হে, গুড নাইট," মেজর বিছানার দিকে গেলেন।

"আরে! আমি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে তবে তো শোবেন।" খাটের তলায় উঁকি মারল অর্জুন, "মালা কেউ ছোড়েনি। স্বপ্ন দেখেছেন। মশারি টাঙাননি কেন? টাঙিয়ে দেব? ভোরের মশা কিন্তু মারাত্মক।"

"না ভাই। আচ্ছা, দু'টো বালিশ ছিল, একটা কোথায় গেল? তুমি নিয়েছ?"

"অদ্ভুত কথা বলেন। নিশ্চয়ই ওপাশে পড়ে গিয়েছে।" অর্জুন ঘুরে খাটের ওপাশে গিয়ে বালিশটাকে দেখে বাঁহাত বাড়াতে যেতেই ফোঁস করে ফণা তুলল একটা কালচে সাপ। মেঝে থেকে অন্তত চার ফুট উঁচুতে ফণাটা উঠতেই ডান হাতে ধরা হাঁড়িয়ার বোতলটা দিয়ে অর্জুন বিদ্যুৎগতিতে আঘাত করল ওর মাথায়। ছিটকে পড়ে গেল সাপটা। লাফিয়ে পাশে গিয়ে চটিপরা ডান পা ওর মাথার উপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরতেই সাপটা কয়েকবার লেজ আছড়ে নেতিয়ে পড়ল।

ওটা মরে গিয়েছে বোঝবার পর অর্জুন সাপটাকে মাথার নীচে ধরে উপরে তুলল। অন্তত এক কেজি ওজনের বিষধর সাপ। এতক্ষণ মেজর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অর্জুন হাসল, "এই আপনার জবাফুলের মালা। স্বপ্নেও রঙের কাছাকাছি গিয়েছিলেন! কেউ ওই জানলা দিয়ে আপনার বিছানায় এটা ছুড়ে দিয়েছিল। বোধ হয় বালিশে ধাক্কা লাগায়, ইনি বালিশের সঙ্গেই নীচে পড়ে যান। নইলে আপনার কী অবস্থা এতক্ষণে হত অনুমান করে দেখুন!"

"মাই গড। এত বড় সাপ ছুড়বে কে?" মেজরের নেশা পাতলা হচ্ছিল।

"কে ছুড়েছিল জানতে হলে, কেন ছুড়েছিল তা জানা দরকার।"

"কেন ছুড়েছিল!" মেজর বিড়বিড় করলেন, "আমি তো এখানে প্রথম এলাম। কারও সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।"

"মনে হচ্ছে, ওরা ঘর ভুল করেছে," অর্জুন বলল, "যাকগে, এখন এসব নিয়ে ভেবে কোনও লাভ হবে না। জানলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আপনি দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ুন।" মরা সাপটাকে জানলার বাইরে ছুড়ে দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল অর্জুন।

"তুমি ঘুমোবে না?"

"না।"

"ও। তা হলে চলো, তোমার খাটে না হয় শোব আমি। মানে, তুমি যখন আজ ঘুমোচ্ছ না, তখন তো খাটটা খালিই থাকবে...!"

"ঘুমোব না, কিন্তু খাটে শোব না কি বলেছি? দরজা বন্ধ করুন।" অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দূরে সাদা কিছুকে সরে যেতে দেখল। যেন কেউ দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। একটু আগে সেই কণ্ঠস্বর জানিয়েছে যে, লুসি জানেন না তিনি বিপদে আছেন। কাল সকালে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

কাল বাকি রাতটা নির্বিঘ্নে কেটেছে। ভোর হল। অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে বিছানায় চলে গেল। ঘুম এল ঝড়ের মতো। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন বেলা এগারোটা। বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে দরজা খুলতে, কাল রাতের সেই লোকটাকে দেখে চা দিতে বলল সে। মিনিটদশেকের মধ্যে চা-বিস্কুট এসে গেল। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে

boiRboi.net

দেখে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবে?"

"আমি গরিব মানুষ। চাকরি চলে গেলে মরে যাব," হাতজোড় করল লোকটি।

"ডিউটির সময় হাঁড়িয়া খাও কেন?"

"আর খাব না স্যার।"

"ঠিক আছে। ওঁরা উঠেছেন?"

"হ্যাঁ স্যার। সেই ভোরবেলায় ওঁরা জঙ্গল দেখতে হাতির পিঠে চড়েছেন, এখনও ফেরেননি," লোকটি বলল।

"হাতির পিঠে?"

"হ্যাঁ স্যার। এখানে প্রত্যেক ভোরে টুরিস্টদের হাতির পিঠে চড়িয়ে গন্ডার-বাইসন দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ওরা ফিরে আসেন সকাল ন'টার মধ্যে। আজ কেন দেরি হচ্ছে জানি না।"

লোকটি কাপ-ডিশ নিয়ে চলে গেলে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। মেজরের ঘরের জানলার নীচে এসে চারপাশে তাকিয়ে সাপটাকে দেখতে পেল না সে। মাটি থেকে বেশ উঁচুতে জানলা। যে ওই ভারী সাপটাকে ছুড়েছিল তাকে অবশ্যই জানলার এপাশে উঠতে হয়েছে। হয়তো ব্যাগের মধ্যে সাপটাকে পুরে রেখেছিল ছোড়ার আগে। কিন্তু উঠল কী করে? চারপাশ তাকিয়ে তেমন কোনও সিঁড়ি বা উঁচু বস্তু চোখে পড়ল না। সে জানলার নীচে এসে ভাল করে লক্ষ করতেই দেখল, দু'টো জুতোর চাপে মাটি অনেকটা বসে গিয়েছে। একজন মানুষের শরীরের ওজনে মাটি অতটা বসে যেতে পারে না। নিজের জুতোর ছাপ পাশে রেখে বুঝল, যে দাঁড়িয়েছিল তাকে প্রচুর ওজন বইতে হয়েছিল। একটু ভাবতেই দৃশ্যটা আন্দাজ করল অর্জুন। একজন মানুষের কাঁধে দু'পা রেখে যদি আর-একজন মানুষ দাঁড়ায়, তা হলে মাটিতে দাঁড়ানো মানুষের জুতো নরম মাটিতে অতটা বসে যেতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে উপরে দাঁড়ানো মানুষটাও জানলার গায়ে পৌঁছে যাবে সহজে।

এই সময় বাইরের গেটে কথাবার্তা শুরু হওয়ায় অর্জুন চলে এল সামনে। হাতি ফিরে এসেছে। লুসি নামলেন স্বচ্ছন্দে। মেজরকে নামাতে হল বেশ কসরত করে। রেঞ্জার এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে মাহুত বলল, "কী করব স্যার! সামনে পাঁচটা হাতি, নড়ছে না সরছে না। পিছনে বাইসনদের দল। ওরা যতক্ষণ সরে না যাবে, ততক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। শেষ পর্যন্ত বাইসনদের দলটা সরে গেলে পিছন দিক দিয়ে অনেকটা ঘুরপথে ফিরে আসতে পারলাম।"

"এরকম তো ওরা করে না। নিশ্চয়ই কোনও ঘটনা ঘটেছে," রেঞ্জার বললেন।

লুসি খুব উত্তেজিত। এত কাছ থেকে হাতি বা বাইসন তিনি কোনও জঙ্গলে দেখেননি। প্রথম দিকে পাখির ডাক রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু শেষ তিনটে উত্তেজনাপূর্ণ ঘণ্টায় সেসব মাথা থেকে উড়ে গিয়েছিল।

মেজর শুধু মন্তব্য করলেন, "গড ইজ গ্রেট।"

"হঠাৎ?" অর্জুন অবাক হল।

"ধরো হাতিকে যদি তার শরীরের সঙ্গে মানানসই চোখ ভগবান দিতেন, তা হলে বাঘ-সিংহ ল্যাজ গুটিয়ে পালাত। সাপটাকে ফেলে দিয়েছি।"

"সাপ! মানে?"

"উঃ। কাল রাত্রে যে সাপটাকে তুমি মারলে...।"

"কখন ফেললেন? কোথায় ফেললেন?"

"ভোরবেলায়। সাফারিতে যাওয়ার আগে। ওপাশের খাদের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। বেশ ভারী ছিল হে। ও হ্যাঁ, জানলার নীচ থেকে এইটে কুড়িয়ে পেয়েছি। কার জিনিস জানি না, যদি কোনও কাজে লাগে।" পকেট থেকে একটা সাদা রঙের লাইটার বের করে অর্জুনকে দিলেন মেজর।

লাইটার হাতে নিয়ে অর্জুন বুঝল এটা বিদেশে তৈরি। একপাশে লেখা রয়েছে, ই ডি টি। এটা লোগো। পাশে লেখা, EXTRUSION, DIES AND TOOLS, 58769 NACHRODT/Tel : 02352-9386-0! না, ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় তৈরি নয় লাইটারটা। মেজরকে ঠিকানা দেখাতে বললেন, "এ জার্মানির লাইটার।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ব্যবহার করেছেন বলে মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, এখন আমেরিকায় এই লাইটার কোনও দোকানে পাওয়া যায় না। আগে অঢেল আসত," মেজর বললেন।

"এর কোনও বিশেষত্ব আছে?"

"শিওর। অন্ধকারে ল্যাম্পের কাজ করে। সোজা দাঁড় করিয়ে ফ্রেম বের করে সুইচ টিপে দিলে চমৎকার জ্বলতে থাকবে। অন্তত কুড়ি মিনিট।"

"আপনার এটা দরকার?"

"নো। পকেটে রাখলেই ধূমপানের ইচ্ছে হবে। নো মোর। তবে তুমি যাই বলো অর্জুন, দ্যাট ওয়াজ এ গ্রেট ড্রিঙ্ক।" চোখ ঘোরালেন মেজর।

"হাঁড়িয়া?"

মাথা নেড়ে টুপিটাকে বাড়ালেন মেজর।

"আপনি তো হুইস্কি-রাম খাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন!"

"করেছি এবং খাব না। কিন্তু ওই বস্তু তো হুইস্কি বা রাম নয়। স্রেফ কাস্ট্রি লিকার। অযত্নে পড়ে আছে। ওর কোয়ালিটির উন্নতি করতে পারলে বিশ্বজয় করা যাবে। আমি ঠিক করেছি সেটাই করব," মেজর আর দাঁড়ালেন না।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতিটিকে এখন খাবার দিচ্ছে মাহুত। চুপচাপ সেই দৃশ্য দেখতে-দেখতে গত রাতের কথা ভাবছিল অর্জুন। অত কষ্ট করে যারা জানলা দিয়ে সাপটাকে ছুড়েছিল তাদের কেউ জার্মান লাইটার ব্যবহার করে। অর্থাৎ খুঁটিমারির বাংলোতে যারা হানা দিয়েছিল তারা উধাও হয়ে যায়নি। নিশ্চয়ই তাদের অনুসরণ করে জলদাপাড়ায় এসেছে। অথচ আসার সময় কোনও গাড়িকে অনুসরণ করতে দেখেনি অর্জুন। তা ছাড়া যদি এসেও থাকে, তা হলে বিকেল থেকে রাতের মধ্যে ওই বিষধর সাপটাকে কী করে জোগাড় করল? ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে এই হলং-এর বাংলো অনেক দূরে। ঢুকতে গেলে অনুমতি নিতে হয়। ওই সাপটাকে নিয়ে ওরা নিশ্চয়ই গাড়িতে করেই এসেছে। অত রাতে গাড়ি ঢুকলে রক্ষীরা নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ করবে। অর্জুন রেঞ্জারের অফিসে গেল।

রেঞ্জার সবে কাজে এসে বসেছেন, অর্জনকে দেখে আপ্যায়ন করলেন। উলটো দিকের চেয়ারে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, গত রাতে কোনও গাড়ি কি এদিকে এসেছিল? তেমন কোনও রিপোর্ট পেয়েছেন?"

" না তো! এদিকে কোনও গাড়ি আসেনি। তা ছাড়া রাতে জঙ্গলের পথে গাড়ি চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আছে। কেন বলুন তো?" রেঞ্জার জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার সন্দেহ হচ্ছে বলেই জানতে চাইছি।"

"সন্দেহের কারণ?"

"আমার সঙ্গী ওই দাড়ি-গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকের বিছানায় কাল রাতে কেউ মোটা সাপ ছুড়ে ফেলেছিল জানলা দিয়ে।"

"সে কী?" রেঞ্জারের চোখ বিস্ফারিত।

"ভাগ্যে বেঁচে থাকা ছিল বলে মেজর মারা যাননি।"

"সাপটা কোথায়?"

"গত রাতেই আমি মেরে জানলার বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। আজ আর ওর মৃতদেহ দেখা যাচ্ছে না। বোধ হয় কোনও প্রাণী খেয়ে ফেলেছে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু ও সত্যি মরেছিল তো!"

"হ্যাঁ। মাথাটা একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল।"

রেঞ্জার টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, "মান সিংহ, কাল রাতে কোনও গাড়িকে ভিতরে ঢুকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল?"

লোকটার জবাব কানে এল অর্জুনের, "আমি রাতের ডিউটিতে ছিলাম না সাব।"

"আঃ, খাতা দ্যাখো!" ধমকালেন রেঞ্জার।

"না সাব। কোনও এন্ট্রি নেই।"

"ডিউটিতে যারা ছিল তাদের কেউ কাছে আছে?"

"একটু দাঁড়ান সাব।" মান সিংহের গলা অস্পষ্ট হল। তারপর আর একটি কণ্ঠ বাজল, "মধুসূদন গড়াই সাহেব। কাল রাতে একটা জিপ ঢুকতে চেয়েছিল, আমরা পারমিশন দিইনি। ওরাও বেশি ঝামেলা না করে মাদারিহাটের দিকে চলে গিয়েছিল।"

"ক'জন ছিল গাড়িতে?"

"তিনজন। একজন সাহেব, মানে সাদা চামড়ার লোক।"

"ঠিক আছে," রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রেঞ্জার, "যেভাবে চেঁচিয়ে কথা বলছিল, তাতে উত্তরগুলো নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন!"

"তা হলে কেউ কাল রাতে জঙ্গলে ঢুকতে চেয়েছিল। আচ্ছা বলুন তো, মেন গেট দিয়ে না এসে অন্য কোনও রাস্তায় ভিতরে আসা যায়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"দেখুন, এত বড় জঙ্গল তো, পাহারা দিয়ে ঢোকা বন্ধ করা যায় না। আমাদের বিট অফিসাররা মাঝে-মাঝেই জঙ্গলে ঘুরে দ্যাখেন, অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে কিনা। জঙ্গলে ঢোকার যেসব পথ আছে, সেগুলো পায়ে চলার পথ, এবড়োখেবড়ো। তবে তার উপর দিয়ে কেউ যদি জিপ চালিয়ে ঢোকে, তা হলে কিছু করবার নেই। অবশ্য জিপের হেডলাইটের আলো চোখে পড়বেই," রেঞ্জার বললেন।

"কাল রাতে সাপটাকে ছোড়া হয়েছিল, যাতে ওর বিষে যাকে ওরা মারতে চায় সে মারা যায়। এই সাপ ওরা কীভাবে পেতে পারে?"

"সাপুড়েদের কাছ থেকে। জঙ্গল থেকে হরিণ-বাঘ ধরা যেমন বেআইনি, সাপও তেমন। তবু সাপ ধরতে অনেক সাপুড়ে জঙ্গলে ঢোকে। বর্ষার সময় এদিকে যখন সাপের অত্যাচার বাড়ে, তখন আমরাই বাধ্য হই ওদের খবর দিতে। তবে হাসিমারার কাছে একটা সেন্টার খোলা হয়েছে মাসদশেক হল। ওরা সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছে, বিষধর সাপের বিষ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু বিষ বের করে নেওয়ার পর সাপগুলোকে আবার জঙ্গলে ছেড়ে দিতে হবে। কোনও অবস্থাতেই মারা বা বিক্রি করা চলবে না। ওই বিষ নাকি নানা ওষুধ তৈরির কাজে প্রয়োজন হয়," রেঞ্জার বললেন।

"ওই সেন্টারে টুরিস্ট হিসেবে যাওয়া যায়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"বেশ তো, কাল বিকেলেই চলুন। আমিও যাব।"

রেঞ্জারের অফিস থেকে বেরিয়েই অর্জুন লুসিকে দেখতে পেল। কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সে হাত নাড়তেই লুসি দাঁড়ালেন। কাছে গিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "রোদ বাড়ছে, এখন কি পাখিরা ডাকবে?"

"দিনের প্রতিটি ঘণ্টায় পাখি ডাকে, এক-এক প্রজাতির পাখি এক-এক সময়। যাবেন নাকি?" লুসি হাসলেন।

"চলুন।"

হাঁটতে-হাঁটতে লুসি জিজ্ঞেস করলেন, "কাল রাতে মেজরের ঘরে যে সাপটাকে মেরেছেন, সেটাকে সত্যি কেউ জানলা দিয়ে ছুড়েছিল?"

"হ্যাঁ। তখন আধা-অন্ধকারে মনে হয়েছিল বেশ ভারী সাপ। সকালে ওটার দেখা না পাওয়ায় ওর জাত বা ওজন সম্পর্কে সন্দেহ থাকছে।"

"কিন্তু মেজরের মতো ভাল মানুষকে কেন কেউ মারতে চাইবে?"

"ঠিক। তা ছাড়া গত রাতে মেজর যে ওই ঘরে থাকবেন, তা তো উনি নিজেই জানতেন না। অথচ যারা মারতে এসেছিল তারা জানল কী করে?"

"এটাই অদ্ভুত লাগছে। ওই ঘরে আমি আমার ব্যাগ রেখেছিলাম। রাতে আপনার ঘর থেকে ফিরে মেজর আমাকে বলল, সে ওই ঘরে শোবে। আমি যদি মাঝখানের ঘরে যাই, তা হলে ভাল হয়।"

"তখন ওঁর হাতে কি একটা বোতল ছিল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও বলল মাঝখানের ঘরে একটাই জানলা আর ওখানে দু'টো। ও জানলার পাশে বসে বোতলের পদার্থ টেস্ট করতে চায়। তারপর তো ডিনারেও এল না, আলোও নিভে গেল। মেজর যে ও ঘরে আছে, তা আমি ছাড়া কেউ জানত না। যে সাপ ছুড়েছিল সে যদি খবর নিয়ে আসে, তা হলে বেয়ারাদের কাছে শুনেছে আমি শুয়ে আছি ওই ঘরে। তা হলে মেজর নয়, আমিই টার্গেট ছিলাম?" লুসি তাকালেন।

"এমন কোনও ইঙ্গিত কি পেয়েছেন, যাতে মনে হতে পারে আপনাকে কেউ মারতে চাইছে?" অর্জুন সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

লুসি মাথা নেড়ে বললেন, "আমার কোনও শত্রু নেই।"

ওরা জঙ্গলের ভিতরে পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটছিল। লুসি বললেন, "আফ্রিকার জঙ্গলে গেলে যে আদিম গন্ধ পাওয়া যায়, তা এদিকের জঙ্গলে নেই।"

"আছে। সুন্দরবনে গেলে সেটা পাবেন। মুশকিল হল, ওখানে বেশিক্ষণ হাঁটা যায় না। হাঁটতে চেষ্টা করলে হয় সাপের কামড় খাবেন, না হয় বাঘের পেটে যাবেন।"

"সুন্দরবন, এখান থেকে কত দূরে?"

"অনেক দূরে। তবে কলকাতার কাছেই।"

লুসি মাথা নাড়লেন। অর্জুন লক্ষ করছিল, মাথার উপর প্রচুর পাখি ডাকা সত্ত্বেও, লুসি সেগুলোকে রেকর্ড করার চেষ্টা করছেন না।

হঠাৎ একটা কাঠঠোকরা বিকট শব্দে জানান দিতেই যন্ত্র খুললেন লুসি। খানিকটা শব্দ রেকর্ড করে নিয়ে বললেন, "এই পাখিরা পৃথিবীর সব দেশে একই আচরণ করে। এদের পক্ষে আটলন্টিক বা প্যাসিফিক পার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ডানায় অত জোর নেই। ধরে নেওয়াই যেতে পারে যে, যে-মহাদেশে জন্মেছে সেখানেই বংশপরম্পরায় থেকে গিয়েছে। তা হলে আচরণ এক হয় কী করে? একটা কাণ্ড দেখবেন?" উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে লুসি ক্যাসেটটা বের করে ব্যাগ থেকে আর-একটা ক্যাসেট ভিতরে ঢুকিয়ে প্লে-বোতাম টিপলেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই যন্ত্রের ভিতর থেকে শব্দটা বের হল। অবিকল কাঠঠোকরার ডাক। বেশ জোরে যেন পাখি ডাকছে। এটা থামতেই গাছের পাতার আড়ালে বসা কাঠঠোকরা ডেকে উঠল। এবারের ডাকটায় যেন আর্তি মেশানো। যন্ত্রের পাখির ডাক শুরু হতেই ওটা থেমে যাচ্ছে। তারপর ডানার ঝটপটানি কানে আসতেই অর্জুন দেখল, গাছের কাঠঠোকরা একেবারে নীচের ডালে উড়ে এসে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। লুসির আঙুল স্টপ বোতামটা টিপতেই যন্ত্র নীরব হল। গাছেরটি বোকা-বোকা মুখ করে অর্জুনদের দেখে উড়ে গেল কোথাও। লুসি বললেন, "এই ডাকটা মেক্সিকোর এক কাঠঠোকরা ডেকেছিল। ইন্ডিয়ান কাউন্টার পার্ট স্বচ্ছন্দে বুঝতে পেরেছে!"

এখন ভরদুপুর। বাংলো থেকে প্রায় আধমাইল দূরের জঙ্গলে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। লুসি অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে নানা পাখির ডাক রেকর্ড করে চলেছেন। রেকর্ড করতে-করতে ফিসফিস করে বলে চলেছেন, 'হারমিট, সিক্লেবিল, থর্নবিল, সোর্ডবিল। অথবা পিনটেল গ্রিন পিজিয়ন, হোয়াইট হেডেড মাউসবার্ড।' অর্জুনের খুব খিদে পেয়ে গেল। সকালে চা আর বিস্কুট ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। জঙ্গলের

boiRboi.com

ভিতরে খাবার পাওয়া অলৌকিক ব্যাপার। আর-একটু এগোলেই জঙ্গলঘেঁষা গ্রাম হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কথাটা বলার জন্য মুখ খুলতেই মেহগনি গাছটা থেকে ভেসে এল, বিপবিপ, বিপ, হুইসলের আওয়াজ। সঙ্গে-সঙ্গে শব্দটাকে রেকর্ড করতে লাগলেন লুসি। পাখিটা ডেকেই চলেছে। পাতার আড়াল থাকায় ওর চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুনের মনে হল, অবিকল টেলিফোনের শব্দ গাছের উপর থেকে ভেসে আসছে। হঠাৎ অনেক দূরের গাছ থেকে বিপ, বিপবিপ ডাক শুরু হতেই পাখিটা ডাক থামাল। লুসি মুখ ঘুরিয়ে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে উড়ে যেতে দেখলেন?"

"না।"

যেদিক থেকে ক্ষীণ ডাকটা আসছিল সেদিকে পা বাড়ালেন লুসি। মিনিটদেড়েকের মধ্যে কানে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ বাজল। অর্জুন বুঝল, ওরা হাঁটতে-হাঁটতে জঙ্গলের প্রান্তে চলে এসেছে। এদিকে বোধ হয় যাতায়াতের রাস্তা আছে। নইলে গাড়ি চলবে কী করে!

লুসিকে ওঁর কাজ করতে দিয়ে, সরু পথ ধরে কিছুটা এগোতেই একটা মাটির রাস্তা দেখতে পেল সে। রাস্তার উপর গাড়ির চাকার দাগ। এই রাস্তা আজকাল কেউ ব্যবহার না করলেও যে গাড়িটা এসেছিল, তার চালক খুব দক্ষ হাতে চালিয়ে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গিয়েছে। চাকার দাগ অনুসরণ করে কিছুটা হাঁটতেই জঙ্গলের বাইরে চলে এল অর্জুন। দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। পাশে ঝোপ, বুনো লতানো গাছ, তারপর পিচের রাস্তা। ন্যাশনাল হাইওয়ে। গাড়ি যাচ্ছে ওখান দিয়ে। কিন্তু ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কারও পক্ষে জঙ্গলের এই প্রবেশপথ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। ড্রাইভার নিশ্চয়ই এর খবর রাখত। মূল গেটে বাধা পাওয়ায় এদিক দিয়ে ঢুকছে।

এই সময় লুসি পাশে এসে দাঁড়ালেন, "কী ব্যাপার?"

"গত রাতে যারা সাপ ছুড়েছিল তারা এই পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকেছিল। বাংলোর যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায়, ততটা আলো নিভিয়ে গিয়ে জিপ থেকে নেমেছিল ওরা। তার মানে বুঝতে পারছেন? ওদের মধ্যে কেউ এই জঙ্গল চেনে। সাপও তার পক্ষে জোগাড় করা স্বাভাবিক," অর্জুন বলল।

"কিন্তু কেন?" লুসি তাকালেন।

"আপনি জানেন না, মেজরেরও জানা নেই। তাই প্রশ্নটার উত্তর একমাত্র ওরাই দিতে পারে। অবশ্য তার আগে আমাদের কেউ যদি খুন হয়ে যায়, তা হলে ব্যাপারটা খুব দুর্ভাগ্যজনক হবে। একটু আগে শুনলাম, ওরা যে গাড়িতে এসেছিল, তাতে একজন সাদা চামড়ার মানুষও ছিল!"

"সাদা চামড়া?"

"হ্যাঁ। আমেরিকা না ইউরোপের তা জানা যায়নি।" ওরা কথা বলতে-বলতে আবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবার পথ বদলে জিপের চাকা অনুসরণ করে যাবে বলে ঠিক করল অর্জুন। ঠিক তখন মাথার উপরে গাছের ডালে সেই পাখিটা বিপবিপ বিপ করে উঠতেই লুসি তড়িঘড়ি রেকর্ডার বের করতে উদ্যোগী হলেন। অর্জুন তাঁকে ফেরার জন্যে তাগাদা দিতে মুখ ফেরাতেই লোকটাকে দেখতে পেল। হাইওয়ে থেকে নেমে বুনো ঝোপের পাশ দিয়ে জঙ্গলের দিকে আসছে।

সে চাপা গলায় বলল, "কোনও শব্দ করবেন না, চটপট লুকিয়ে পড়ুন।" তারপর দ্রুত ছুটে গেল শালগাছগুলোর পিছনে। কিছু না বুঝেও লুসি চলে এলেন পাশে। অর্জুন ঠোঁটে আঙুল চেপেই ইশারা করল সামনের দিকে তাকাতে।

প্রথমে শিস শোনা গেল। তারপর লোকটাকে দেখা গেল। পকেট থেকে একটা বড়সড় সিগারেটের প্যাকেট বের করে গন্ধ শুঁকল একটু। ওটা যে বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই অর্জুনের। প্যাকেটটাকে পকেটে রেখে আবার শিস দিতে-দিতে চলে গেল লোকটা এবড়োখেবড়ো জিপ চলা পথ দিয়ে।

লুসি জিজ্ঞেস করলেন, "হু ইজ হি?"

"আমি জানি না। তবে মনে হচ্ছে ফরেস্টের একজন কর্মী। চলুন, এবার ফেরা যাক।" অর্জুন হাঁটা শুরু করল।

"নমস্কার স্যার। আপনারা এদিকে?" দু'টো লোক যেন জঙ্গল ফুঁড়ে ওদের সামনে হাজির হল। দু'জনের কাঁধেই বন্দুক, পরনে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ইউনিফর্ম।

"ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। আপনারা?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমরা ফরেস্টের স্টাফ। পাহারা দিতে বেরিয়েছি।"

"এদিকে জন্তু-জানোয়ার থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই তো!"

"নেই বলব না। তবে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি। এদিকের সব জানোয়ার জঙ্গলের ওপাশে চলে গিয়েছে। এরকম ব্যাপার সাধারণত হয় না।"

"হয়তো কোনও কারণে ভয় পেয়েছে। চোরাশিকারিরা নিশ্চয়ই এদিকে আসে। ওদিকের হাইওয়ে খুব দূরে নয়। ঢুকে পড়তে কতক্ষণ!" অর্জুন বলল।

"এই গাদাবন্দুক দিয়ে ওদের আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না জেনেও আমরা সাহস দেখাই। সরকার যদি বন্দুকগুলো বদলে না দেয়, তা হলে আর কতদিন সাহস থাকবে জানি না।"

হঠাৎ দ্বিতীয় লোকটা গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেয়ে প্রথমজনকে ডেকে দেখাল। প্রথমজন চটজলদি উবু হয়ে বসে আঙুল দিয়ে চাকার দাগ পরীক্ষা করতে-করতে বলল, "এটা রেঞ্জার সাহেবের জিপ নয়। এত বড় জঙ্গল কি সব সময় চোখে-চোখে রাখা যায়! বদমাশরা হাতি-বাইসনকেও ভয় করে না।"

"গন্ডার?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"এখানকার গন্ডাররা ঝামেলা এড়িয়ে চলে। আচ্ছা স্যার...।"

ওরা হেঁটে এল পথটা। জিপ চলতে পারে, কিন্তু হাঁটার পক্ষে খুব কষ্টকর রাস্তা। হঠাৎ চোখে পড়ল জিপের চাকার দাগ ঘুরেছে। অর্থাৎ এখান থেকে জিপটা ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বাংলোর সামনে ওরা পৌঁছোল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এখন দুপুর দেড়টা। গত রাতে যে লোকটা হাঁড়িয়া এনে দিয়েছিল, সে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল। বলল, "সাব, খাবার তৈরি।"

"পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। ওই সাহেব কোথায়?"

"উনি ওঁর ঘরে কুকুরকে ট্রেনিং দিচ্ছেন।"

"কুকুর?" অর্জুন অবাক। লুসি ঢুকে গেলেন তাঁর ঘরে। অর্জুন দেখল, মেজরের ঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু ভিতর থেকে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসছে। সে দরজা ঠেলতেই ওটা খুলে গেল। দৃশ্যটা দেখে চোখ কপালে উঠল অর্জুনের। বারমুডা আর গেঞ্জি পরে হামাগুড়ি দিচ্ছেন মেজর। তাঁর সামনে মাসদেড়েক বয়সি একটি নেড়ি কুকুরের বাচ্চা। মেজর বলছেন, 'ইউ মাস্ট ফাইট, খপ করে ধরবি। ফাইট।" কিন্তু মাটিতে পড়ে থাকা একটি দড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেড়ির বাচ্চাটার নেই।

"মেজর! কী করছেন?" অর্জুন ঘরে ঢুকল।

"কে? ও তুমি! ট্রেনিং দিচ্ছি। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা কখনও যুদ্ধ করেনি তো, তাই এটাকে লড়াকু করে তুলতে সময় লাগবে। কাম অন মাই বয়, ফাইট!"

"ও কার সঙ্গে লড়াই করবে?"

"সাপের সঙ্গে। যে কেউ জানলা দিয়ে সাপ ছুড়ে আমাকে মেরে ফেলবে, তা চলবে না। একটা বেজি কিংবা ময়ূর পাওয়া গেলে খুব ভাল হত। কিন্তু ওরা বন্যপ্রাণী, ওদের ধরা চলবে না। তাই এটাকেই তৈরি করছি। কাম অন...।" মেজরের কথাগুলো বেশ জড়ানো। অর্জুনের বুঝতে অসুবিধে হল না উনি পান করেছেন।

BanglaBook.org

"মেজর! আপনি ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন!"

"ইয়েস। নো মোর হুইস্কি-রাম-ভদকা।"

"কিন্তু এই ভরদুপুরে আপনি পান করেছেন?"

"ওঃ! কাল রাতে প্রথম হাঁড়িয়া খেয়েছিলাম। আজ মনে হল, রাতে যেরকম লেগেছিল দিনের বেলায় সেরকম লাগে কিনা দেখতে হবে। তাই আর-একটা বোতল হাঁড়িয়া আনিয়ে টেস্ট করলাম। বুঝলে ব্রাদার, ভালভাবে বট্‌লিং করে এক্সপোর্ট করলে এ জিনিস গোটা পৃথিবী লুফে নেবে। এদেশের বেকার সমস্যা এক মাসে দূর হয়ে যাবে," বলতে-বলতে মেজর চোখ বন্ধ করে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। সেই সুযোগে নেড়ির বাচ্চা দৌড় লাগাল খোলা দরজা সামনে পেয়ে।

"মেজর, আপনার স্নান হয়ে গিয়েছে?"

"ইয়েস।"

"নীচে আসুন। লাঞ্চ রেডি হয়ে গিয়েছে," অর্জুন বেরিয়ে এল।

লাঞ্চের পর লুসির ইচ্ছে ছিল উলটো দিকের জঙ্গলে ঢোকার। কিন্তু ওদিকে একটা বড়সড় হাতির দল এসেছে শোনবার পর তিনি বিশ্রাম নিতে ঘরে চলে গেলেন। মেজরের খুব ঘুম পেয়ে গেল। গত দু'টো রাত প্রায় জেগেই কাটাতে হয়েছে অর্জুনকে। তাকেও বিছানা টানছিল। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে সে বিশাল জঙ্গলের মাথা দেখতে-দেখতে রেঞ্জারের অফিসের দিকে চোখ নামাতেই লোকটাকে দেখতে পেল। চোরাই পথ দিয়ে শিস দিতে-দিতে ঢুকেছিল লোকটা। বিদেশি সিগারেটের ঘ্রাণ নিচ্ছিল মাঝে-মাঝে। এখন লোকটা হাত নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে। তারপর ঢুকে গেল রেঞ্জারের অফিসে।

বড়জোর ঘণ্টাআড়াই ঘুমিয়েছিল অর্জুন। হঠাৎ মাথার ভিতর সেই অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। পাশ ফিরে শোওয়া অবস্থায় সে চোখ অল্প খুলতেই দেখতে পেল, মোবাইলের আলো দপদপ করছে। তারপরই শুরু হল, বিপ, বিপ, বিপ। যোগাযোগ করার জন্য মরিয়া চেষ্টা চলছে বলে মনে হল। তারপরই শব্দটা থেমে গেল। অর্জুন পরিষ্কার শুনতে পেল, "কেমন আছ অর্জুন?"

"আমাকে চিনতে পারছ না? আমি বিষ্টুসাহেব। সেই কালিম্পংয়ের!"

"ও হ্যাঁ। আপনার গলা চিনতে পারিনি। আপনি তো এখন আমেরিকায়!"

"হ্যাঁ। আমার বন্ধু প্রোফেসর ক্যালডার মুলেনের সৌজন্যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। বন্ধু অমল সোম তোমার ব্রেন স্ক্যানিংয়ের রিপোর্ট আর মোবাইল নম্বর আমাকে পাঠিয়েছিলেন," বিষ্টুসাহেব বললেন।

"কিন্তু মোবাইল সেট ছাড়া কী করে আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি?"

"না, না। তোমার মোবাইল অফ থাকলে আমার কথা তুমি শুনতে পেতে না। যন্ত্রটির ব্যাটারির সাহায্যে তোমার মস্তিষ্কে আমার কথা পৌঁছচ্ছে, বছরখানেকের মধ্যে এই আবিষ্কারের ফল ভোগ করবে গোটা পৃথিবী। যাক গে, লুসি কেমন আছে?"

"ভালই আছেন।"

"তুমি কি ওর মুখে প্রোফেসর মুলেনের নাম শুনেছ?"

"না।"

"ওকে জিজ্ঞেস করো, সব জানতে পারবে। গুড বাই!"

অর্জুন চোখ খুলল। হাত বাড়িয়ে মোবাইল সেট তুলে দেখল, একটি প্রাইভেট কল এসেছিল। কোনও নম্বর ফুটে ওঠেনি।

বিষ্টুসাহেবের মুখ মনে এল। কালিম্পংয়ে দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। প্রিয় কুকুর মারা যাওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। মেজরের সঙ্গে পরিচয় ওঁর মাধ্যমে। তারপর খুব অসুস্থ হয়ে বিদেশে চলে যান। বোঝাই যাচ্ছে, বিষ্টুসাহেব-মেজর-অমলদার মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু বিষ্টুসাহেব যাঁর কথা বললেন, সেই প্রোফেসর মুলেনের এই আবিষ্কার যেদিন পৃথিবী জানবে, সেদিন হইহই পড়ে যাবে। শুধু যার সঙ্গে কথা বলতে চাই, তার ব্রেনের অবস্থান ঠিকঠাক জানা চাই। আর চাই তার মোবাইল নম্বর। পৃথিবীর যে দেশেই থাকো, সেই মোবাইলের সাহায্যে মাথার ভিতর শব্দগুলো পৌঁছে দেওয়া যাবে। ফলে ঘুমন্ত অবস্থাতেও কথা বলতে অসুবিধে নেই। আর এই সংলাপ অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অর্জুনের মনে হল, সে শুধুই শুনতে পাচ্ছে। ইচ্ছে হলেও বিষ্টুসাহেবকে কোনও কথা বলতে পারছে না। কারও মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে কী যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, তার চেহারাই বা কী, তা সে জানে না। বিষ্টুসাহেবও তাকে জানাননি।

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে চা খেতে-খেতে মেজর সব শুনলেন। লুসি তখনও তাঁর ঘরে, খবর পাঠানো হয়েছে চা খেতে আসবার জন্য। অর্জুন বলল, "এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনাদের অনুসরণ করা হচ্ছে।"

"কারা করছে? কারা? ওই সাপ যদি আমাকে ছোবল মারত, তা হলে কী হতে পারত ভাবলেই বুক কেঁপে উঠছে! আচ্ছা মানলাম, ওরা আমাদের অনুসরণ করে খুঁটিমারি বাংলোয় এসেছিল। ভোরবেলায় পালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। কিন্তু ওদের পাওয়া যায়নি। আমরা যে বিকেলে এখানে আসব, সেটা ওদের জানার কথা নয়। এখানে কোনও বুকিং ছিল না," মেজর মাথা নাড়লেন।

"মোবাইল ফোনের দৌলতে ওরা নিশ্চয়ই জেনেছিল আমরা বাংলো ছেড়ে জলদাপাড়ার দিকে এগোচ্ছি। লুসি যে পাখির ডাক রেকর্ড করার জন্যে জঙ্গলে ঢুকবেন, এটা তো ওদের জানা তথ্য। ময়নাগুড়ি হয়ে গোরুমারার দিকে না গিয়ে, মাদারিহাটের রাস্তা ধরতেই ওরা বুঝে গিয়েছিল আমাদের ডেস্টিনেশন হল জলদাপাড়া," অর্জুন যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইল।

"বেশ। এবার সাপ! সন্ধেবেলায় এই এলাকায় পৌঁছে ওরা অত বড় বিষধর সাপ জোগাড় করে ফেলল? সারারাত সময় দিলে তুমি পারবে? আমি তো এক সপ্তাহ সময় পেলেও পারব না," মেজর বললেন।

এই সময় টর্চের আলো গেট খুলে এগিয়ে এল। অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আসুন রেঞ্জারসাহেব। আমরা এখানে গল্প করছি।"

"না অর্জুনবাবু। আমাকে এখনই কোচবিহার ছুটতে হবে। আমি আপনাকে খবরটা দিতে এলাম। মাদারিহাটে আমরা একটা ট্রানজিট সেন্টার করেছি। যেসব হিংস্র প্রাণী জঙ্গলের বাইরে এসে অথবা চা-বাগানের ভিতর ধরা পড়ে, তাদের ওখানে রাখা হয় কয়েকদিন। একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে, আবার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। আজ বিকেলে ধরা পড়েছে যারা, তাদের একটিকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তার মানে?" অর্জুন অবাক।

"গরম লাগলে অনেকেই দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে ভিতরে। কিন্তু বিকেলে খাবার খেতে বের হয়। আজ হয়নি," রেঞ্জার বললেন।

"প্রাণীটি কী ধরনের?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"সাপ। যে সাপটির কথা আপনি আজ সকালে বলেছেন, তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কাল সন্ধের পরে খাঁচার পিছনের তক্তা খুলে ওকে চুরি করেছে কেউ। খাঁচার ভিতর সাপের সুবিধের জন্যই দিনের বেলাতেও অন্ধকার করে রাখা হয় বলে কর্মীরা বুঝতে পারেনি। আমি ডি এফ ও-কে জানিয়েছি। থানাতেও ডায়েরি করা হয়েছে," রেঞ্জার বললেন, "ব্যাপারটাকে আর হাল্কাভাবে নেওয়া যাচ্ছে না, সাবধানে থাকবেন।"

"মাই গড!" মেজর চাপা গলায় বললেন।

টর্চের আলো ফিরে গেল।

অর্জুন বলল, "একটা ভুল হয়ে গেল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ওই লোকটা সম্পর্কে রেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

এই সময় লুসি এলেন। চেয়ারে বসে টি-পট থেকে কাপে চা ঢেলে নিয়ে বললেন, "আমরা কি কাছাকাছির জঙ্গলে এখন একটু যেতে পারি না?"

মেজর বললেন, "না যাওয়াই ভাল। এখানে যে সাপ আছে তা প্রমাণিত!"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা লুসি, আপনি দু'দিনে যত পাখির ডাক রেকর্ড করেছেন, তা কি গবেষণার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

লুসি তাকালেন, "আমি ঠিক জানি না। যাদের ডাক পেয়েছি, তাদের বাইরে এমন অনেক পাখি থাকতেই পারে।"

"প্রোফেসর ক্যালডার মুলেন কি স্পেসিফিক কিছু বলে দেননি?"

চমকে তাকালেন লুসি। প্রথমে অর্জুনের দিকে, তারপর মেজরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি প্রোফেসরের কথা ওঁকে বলেছ?"

"না তো! ওঁর বিষয়ে কোনও কথাই হয়নি। তা ছাড়া প্রোফেসরকে আমি খুব কম জানি। বিট্টুসাহেব আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তুমি যে ওঁর অধীনে গবেষণা করছ, তাও বিট্টুসাহেবের কাছেই শুনেছি। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগায় এদেশে আসতে আপত্তি করিনি," মেজর বললেন।

"তা হলে আপনি প্রোফেসর মুলেনের কথা জানলেন কী করে?"

"ধরে নিন, বিট্টুসাহেব জানিয়েছেন," অর্জুন বলল।

"হ্যাঁ। প্রোফেসর মুলেন আমাকে বিশেষ কয়েকটি পাখির ডাক রেকর্ড করতে বলেছেন। তবে তার বাইরে যে করা যাবে না, তাও বলেননি?"

"লুসি, প্রোফেসর মুলেন যে বিষয়ে গবেষণা করছেন, তার সঙ্গে পাখির ডাকের সম্পর্ক কী?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"গবেষণার বিষয়ে আপনি কি জানেন?"

"কিছুটা।"

"ও। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে অনেক সময় লাগবে।"

"আপনি কি ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করছেন?"

লুসি তাকালেন, "এখন তো সেই রকমই মনে হচ্ছে।"

"কেন মনে হচ্ছে? কেউ তো আপনাকে এদেশে আসার পর ভয় দেখায়নি!" অর্জুন হাসল।

লুসি তাকালেন, "প্রোফেসর মুলেন ইদানীং বাড়ি থেকে বেরোন না। লং আইল্যান্ডের যে বাড়িতে তিনি থাকেন, সেখানে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। তবু তার মধ্যেই মাফিয়ারা তাঁর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, যে নতুন আবিষ্কার তিনি করেছেন, যা এখনও পরীক্ষার স্তরে আছে, তার পেটেন্ট ওরা কিনে নিতে চায়। তার জন্য ওরা তাঁকে এক বিলিয়ন ডলার দিতে রাজি আছে। কিন্তু প্রোফেসর মুলেন তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট হাতছাড়া করবেন না। বুঝতেই পারছেন, এই প্রত্যাখ্যান মাফিয়ারা ভাল মনে নিতে পারে না," লুসি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

"বুঝলাম না। আপনার সঙ্গে কারও তো শত্রুতা নেই। তা হলে আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমি দীর্ঘদিন ধরে পাখির ডাক নিয়ে গবেষণা করছি। এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই প্রোফেসর মুলেনের সাহায্য নিয়েছি। আমার গবেষণার বিষয় হল, পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে মানুষ জন্মাবার পর গোষ্ঠীগতভাবে ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে কথা বলার জন্য। ক্রমশ কাছাকাছি গোষ্ঠীর মানুষরা একত্রিত হলে তাদের ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছিল প্রয়োজন মেনে। কিন্তু একই মহাদেশ তো বটেই, একই দেশের মানুষ নানা ভাষায় কথা বলে। কেউ কারও ভাষা বুঝতে পারে না। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহাদেশের ভাষা তো সম্পূর্ণ আলাদা হবেই। কিন্তু কিছু ধ্বনি বা অভিব্যক্তির বা শব্দের মিল পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেগুলো তো কথা বলে বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমি অবাক হলাম, যখন দেখলাম, আফ্রিকার কিছু পাখির ডাকের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার কিছু পাখির ডাকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দু' দেশের পাখির ডাক কম্পিউটারে ফেলে দেখা গেল নোটেশন হুবহু এক। ব্রাজিলের সেই পাখির ডাক, আফ্রিকার জঙ্গলে বাজালে দেখেছি ওখানকার ওই বিশেষ পাখিরা চঞ্চল হচ্ছে। গোটা পৃথিবীতে এক রকম ডাক ডাকে যেসব পাখি, তাদের চিহ্নিত করতে পারলে এত দিনের মেনে নেওয়া থিওরিগুলোকে বাতিল করতেই হবে। যেসব পাখির ডাক একই রকম, তাদের ডানায় তেমন জোর নেই। যা থাকলে ভারত, প্রশান্ত বা অতলান্তিক মহাসাগর পার হওয়া সম্ভব! তা হলে এরা এক ভাষায় কথা বলতে শিখল কী করে? চিনের কোনও মানুষের মুখের বুলির সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার কোনও মানুষের এক ফোঁটা মিল কি পাওয়া যাবে? না। তা হলে দাঁড়াচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশের পাখিদের কেউ-কেউ একই ভাষায় কথা বলে। সেই ভাষাকে যদি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ অফ বার্ডস বলা যায়, তা হলে নিশ্চয়ই খুব বাড়াবাড়ি হবে না," লুসি থামলেন।

"ব্যাপারটা সত্যি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আপনি কেন ভয় পাবেন বুঝতে পারছি না।"

"প্রোফেসর মুলেন এই বিশেষ ডাকটাকে সাঙ্কেতিক ভাষা হিসেবে তাঁর আবিষ্কারে ব্যবহার করতে চান। ধরুন, আপনার মোবাইলের মাধ্যমে কেউ কোনও খবর দিতে চায়। আপনার মোবাইলের ব্যাটারি তার ক্ষমতার রেঞ্জে আপনাকে পেলে তবেই বার্তা পেতে পারবেন। এই রেঞ্জটা খুব বেশি হলে সাধারণ একটি ঘরের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু বিশেষ একটি পাখির ডাক আধমাইল দূর থেকেও শোনা যায়। আমি এর বেশি বলার অধিকারী নই। যে পাখিটিকে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে পেয়েছি, তারা আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। ওই যে, বিপবিপ বিপ বলার পর হুইসলের শব্দ তোলে যে পাখি! প্রোফেসর মুলেন ওই ডাকটাকে সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করতে চান। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওই সিগন্যাল পাখির ব্রেনে পৌঁছে গেলেই সে ডেকে উঠবে। আর সেই ডাক ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র। যারা পেটেন্ট চেয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে, আমি কেন ভারতে এসেছি। আমার উপর আঘাত করে ওরা প্রোফেসর মুলেনের মনে চাপ সৃষ্টি করতে চায়, যাতে উনি বাধ্য হন ওদের শর্ত মেনে নিতে।"

"এটা যখন বুঝতে পারছেন, তখন ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন? নিজের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করেননি কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

লুসি প্রশ্নটা শুনে মেজরের দিকে তাকালেন।

মেজর এতক্ষণ বেতের চেয়ারে শরীর এলিয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। লুসি তাকাতে সোজা হয়ে বসলেন, "আসলে ব্যাপারটা তোমাকে বলা হয়নি। বিট্টুসাহেব প্রোফেসর মুলেনের কাছে লুসির ভারতবর্ষের এদিকটায় আসার পরিকল্পনা শুনে আমাকে ফোন করেন। ওর নিরাপত্তা নিয়ে কথা হয়। পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাইলে তাদের ব্যাপারটা বোঝানোই মুশকিল হয়ে যেত। তা ছাড়া প্রোফেসরের গবেষণার বিষয়ে সম্পর্কে পুলিশ বিশদ জানতে চাইত। তখন ওর ভিসা নিয়েও অসুবিধে হত। তা ছাড়া প্রোফেসর মুলেন চাইছিলেন লুসির ভারতবর্ষে আসাটা যেন মিডিয়া না জানতে পারে। তখন আমি অমল সোমের সঙ্গে যোগাযোগ করি। প্রোফেসর মুলেনের সঙ্গেও অমল সোমের কথা হয়। তিনিই তোমার নাম প্রস্তাব করেন। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে যে কোনও পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবে বলে ভরসা দেন। আমিও আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমাকে সমর্থন করি।"

অর্জুন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল,

boiRboi.blogspot.com

"প্রোফেসর মুলেন কোন দেশের মানুষ? আমেরিকা তো সব দেশের মানুষের মিলনভূমি।"

"উনি জার্মান!"

"আচ্ছা! আর ওই মাফিয়ারা? ওরা নিশ্চয়ই ইতালির লোক!"

মেজর মাথা নাড়লেন, "মাফিয়া শব্দটা শুনে তুমি ভাবছ ওরা ইতালির লোক? না অর্জুন, এখন মাফিয়ারা আর কোনও একটা বিশেষ দেশে আটকে নেই। সর্বত্র ওদের যাতায়াত।"

"প্রোফেসরের এই আবিষ্কারের কথা আমেরিকান সরকার জানেন?"

লুসি জবাব দিল, "নিশ্চয়ই অজানা নয়। কিন্তু আবিষ্কার সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রোফেসর কারও সঙ্গে কথা বলতে চান না। তবে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি খানিকটা আন্দাজ করে ব্যবসা বাড়ানোর মতলব করছে। তার ফলেই ওইসব মাফিয়ারা এখন সক্রিয়।"

অর্জুন দেখল বাংলোর সেই কর্মচারী, যে মেজরকে হাঁড়িয়া খাইয়েছিল, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ডাকল সে, "কিছু বলবে?"

"বাবুর্চির খুব জ্বর এসেছে," লোকটি জবাব দিল।

"তা হলে?"

"সাহেব যদি গাড়ির ড্রাইভারকে বলে দেন, তা হলে আমি এখন গিয়ে মাদারিহাট থেকে খাবার কিনে আনতে পারি।"

"সেটা করাই যেতে পারে। কিন্তু তোমরা কী খাবে?"

"আমরা?" লোকটা স্পষ্টতই অবাক হল।

"তোমরা যারা এখানে কাজ করো, তারা কী খাবে?"

"ভাত, ডিম, আলু। সাহেবরা তো তা খেতে পারবেন না। যাই?"

"আধঘণ্টা পরে এসে জেনে যেও," অর্জুন বলল।

লোকটা ফিরে যাচ্ছিল, অর্জুন আবার তাকে ডাকল, "এই যে ভাই!"

লোকটা দাঁড়াল। মুখ ঘোরাল।

"তুমি গত রাতে এবং আজ সকালে সাহেবকে হাঁড়িয়া এনে দিয়েছিলে। কোত্থেকে?"

"লছমনের কাছ থেকে।"

"লছমন কে?"

"ফরেস্ট অফিসের পিয়ন।"

"ও এসবের স্টক রাখে?"

"হ্যাঁ সাহেব। ওর কাছে সব পাবেন। বিলিতি মদও বিক্রি করে। তা ছাড়া, লেডিস ছাতা, সিগারেট...। বিদেশি সিগারেট, বিদেশি সেন্ট।"

"বাঃ! চমৎকার। দেখা যাবে জিনিসগুলো?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।"

"আমি তা হলে ওকে খবর দিই?"

"বেশ।"

লোকটি চলে গেলে মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "স্মাগলার?"

"ঠিক তা নয়। এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কেউ-কেউ ওসব জিনিস টুরিস্টদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে। নর্থ বেঙ্গলে বাংলাদেশ আর ভুটানের দৌলতে বিদেশি জিনিসগুলো ঢালাও বিক্রি হয়। যাকগে, আজ রাতে আমরা বাংলোয় থাকব না। যারা গত রাতে সাপ ছুড়ে ফেলেছিল, তারা আজ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই," অর্জুন বলল।

"বাংলোয় থাকব না মানে? কোথায় থাকব?" মেজর অবাক।

"হয় খাবার আনার নাম করে আমরাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি। এখান থেকে সুভাষিণী চা-বাগান বেশি দূরে নয়। ওই বাগানের ম্যানেজার অনিন্দ্য আমার খুব পরিচিত। রাতটা ওদের গেস্টহাউজে কাটিয়ে দিতে পারি। ওখানে কেউ লুসির কাছে পৌঁছতে পারবে না। নয়তো ডিনার আনিয়ে খেয়ে নিয়ে, ঘরে শুতে যাওয়ার বায়না করে চুপিসারে জঙ্গলে ঢুকে অপেক্ষা করতে পারি ওদের জন্য," অর্জুন বলল।

"গোটা রাত?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"দরকার হলে তাই।"

"কিন্তু রাতের জঙ্গলে নিশ্চয়ই মশা থিকথিক করছে। তা ছাড়া হাতিফাতি চলে এলে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে।"

"তা হলে প্রথমটাই করা যাক।"

"না। দ্বিতীয়টা অনেক বেশি থ্রিলিং। আমি অবশ্য আমার কথা ভেবে এসব বলছি না। বলছি লুসির কথা ভেবে। কঙ্গোর জঙ্গলে আমি তিন রাত গাছের উপরে বসে কাটিয়েছি। এক ওয়াটারবট্‌ল জল ছিল, তাই খেয়ে ছিলাম। গাছের নীচে সারারাত-দিন সিংহ, হায়েনা, টাইগার এমনকী, র‍্যাটল-স্নেককেও ঘুরঘুর করতে দেখেছি। তবু নার্ভ শক্ত রেখেছিলাম হ্যাঁ," মেজর বললেন।

"কঙ্গোয় সিংহ পাওয়া যায়?"

"প্লেন্টি!" ঠোঁট ওলটালেন মেজর।

"তা হলে তো আপনার কোনও সমস্যা নেই। তা হলে লুসিকেই ওখানে রেখে আসি। ওঁকেই তো ওরা টার্গেট করেছে!" অর্জুন দেখল লোকটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে, "ও একটু মাদারিহাট গিয়েছে সাহেব।"

"কী করে যাও তোমরা? হেঁটে?"

"না, সাইকেলে। খাবার আনতে যাব?"

"নাঃ! এখানে বসে থেকে সাহেবদের একঘেয়ে লাগছে। আমরাই যাই। গিয়ে ডিনার সেরে ফিরব। তুমি পদমবাহাদুরকে তৈরি হতে বলো। অর্জুন মাথা নাড়ল। মনে হচ্ছিল, লোকটি বেশ হতাশ হয়েছে।

সন্ধে সাড়ে ছ'টায় ওরা গাড়িতে উঠে বসল। লুসি তাঁর টেপ রেকর্ডার এবং রেকর্ডেড ক্যাসেটগুলো সঙ্গে নিয়েছেন। নির্জন বনপথে গাড়ি চালাতে-চালাতে পদমবাহাদুর বলল, "ওই বাংলোয় ভূত আছে সাহেব।"

"ভূত?" মেজর পিছনের সিটে লুসির পাশে বসেছিলেন, চমকে জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, সাহেব। কাল রাতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। জঙ্গল থেকে বেরোচ্ছিল আবার ঢুকে যাচ্ছিল।" পদমবাহাদুর বলল।

"তুমি তখন কী করছিলে?" পাশে বসা অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমি তো গাড়িতে শুয়েছিলাম। ওসব দেখে জানলার কাচ তুলে দিলাম। ভূতগুলো বুঝতে পারেনি আমি গাড়ির ভিতরে আছি।"

"ভূতগুলো মানে?"

"তিনজন। সাহেব, আজ রাতে আমি আর গাড়ির ভিতর শোব না।"

"তুমি তো ইচ্ছে করলে ডাইনিং রুমে শুতে পারতে।"

"ওরে বাপ! মশা আমাকে শেষ করে দিত।"

"কিন্তু গাড়িতে কেউ না থাকলে আবার ইঞ্জিনের বারোটা বাজাতে চাইবে ভূতগুলো। ঠিক আছে, আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে গাড়িতে থাকব," অর্জুন বলল।

"তা হলে মুশকিল হবে না। আপনি পিছনে শোবেন, আমি সামনে।" পদমবাহাদুর এই সমাধানে খুশি হল।

জঙ্গলে ঢোকার প্রধান গেটে নামধাম লিখিয়ে বেরোবার সময় অর্জুন জানাল, ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে।

মাদারিহাটের দিকে না গিয়ে হাসিমারার দিকে গাড়ি চালাতে বলল অর্জুন। দু'পাশে ঘন অন্ধকার। একটা ব্রিজ পার হয়ে গেল গাড়ি। রাস্তাটা বাঁ দিকে ঘুরতেই অর্জুন চাপা গলায় পদমবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করল, "হেডলাইট নিভিয়ে চালাতে পারবে?"

"পারব। তবে বেশি দূরে যেতে পারব না। খুব অন্ধকার।"

"চেষ্টা করো। গাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিয়ে চলো।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঝপাং করে যেন অন্ধকার ওদের গিলে ফেলল। ওই অবস্থায় গাড়ি চালানো মুশকিল। অর্জুন বলল, "বাঁ দিকের জঙ্গলের মধ্যে নেমে যাও।"

"সাহেব, ওখানে গর্ত থাকতে পারে।"

"আমার মনে হচ্ছে নেই।"

অতএব গাড়ির গতি শ্লথ করে পিচের রাস্তা ছেড়ে নড়বড় করতে-করতে গাড়ি যেখানে দাঁড়াল, তার সামনে ঝোপঝাড়।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী হল?"

"আমাদের কেউ ফলো করছে কিনা দেখা দরকার," অর্জুন বলল।

"ওঃ! তাই বলো।"

অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল। লুসি বললেন, "একটু বাইরে যেতে পারি?"

অর্জুন বলল, "খুব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরনোই উচিত।"

"কেন?" লুসি জিজ্ঞেস করলেন।

"এই জঙ্গলের সাপ খুব বিখ্যাত। তা ছাড়া জোঁক তো আছেই।"

মিনিটপাঁচেকের মধ্যে মাদারিহাট থেকে দু'টো ট্রাক ছাড়া কোনও গাড়িকে আসতে দেখা গেল না। উলটো দিক থেকে আসা গাড়ির সংখ্যাই বেশি। যদি কেউ তাদের অনুসরণ করত, তা হলে এই সময়ের মধ্যেই বোঝা যেত।

অর্জুন যখন পদমবহাদুরকে বলতে যাচ্ছিল আবার রওনা হতে, ঠিক তখনই হেডলাইটের আলো দেখা গেল। গাড়িটা আসছে মাদারিহাট থেকে। গাড়ির গতি কমে গেল হঠাৎই। একটা লোক চিৎকার করে কথা বলছে মোবাইলে। বারংবার 'হ্যালো, হ্যালো' বলছে। এত দূর থেকে কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তারপর গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে গেল মাদারিহাটের দিকে। অর্জুন পদমবাহাদুরকে বলল, "চলো।"

লুসি জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"আমরা যে হাসিমারায় পৌঁছইনি, এই খবরটা মোবাইলে জানানো হল। তাই ওরা ফিরে গেল মাদারিহাটেই আছি কিনা দেখতে," অর্জুন বলল।

"তার মানে ওরা আমাদের অনুসরণ করছে!" মেজর বললেন, "কিন্তু মাদারিহাটে ফিরে গেল কেন? আমরা তো এই পথের অন্য কোথাও থাকতে পারি!"

"এর উত্তর একটাই। আমাদের পরপর যে দুটো ট্রাক হাসিমারার দিকে গিয়েছে, তাদের কাছ থেকে ওরা শুনেছে, রাস্তায় এই রকম কোনও গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি।"

"তা হতে পারে," মেজর মাথা নাড়লেন, "তার মানে হাসিমারা এবং জলদাপাড়া, দু'টো জায়গাতেই ওদের লোক রয়েছে।"

অর্জুন উত্তর দিল না।

ওরা যখন সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সামনে পৌঁছোল, তখন রাত আটটা। বাংলোর চৌকিদার জানাল, বড়সাহেব কলকাতায় গিয়েছেন মিটিং করতে। কিন্তু লোকটা অর্জুনকে চিনতে পারল। অর্জুন এই বাংলোয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কয়েকবার এসেছিল। অনিন্দ্য ম্যানেজার হয়ে আসার পরেও এসেছিল। কিন্তু দরোয়ানের ক্ষমতা নেই গেস্টহাউজের দরজা খুলে দেওয়ার। সে ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে খবর দিল।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চলে এলেন মিনিটআটেকের মধ্যে। অর্জুনকে তিনি ভাল করে চেনেন। তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফোন করে অনিন্দ্যকে ধরলেন। কথা বলে রিসিভার দিলেন অর্জুনকে।

অনিন্দ্য বললেন, "কী আশ্চর্য! আপনি হঠাৎ...। একটু জানিয়ে আসবেন তো!"

অর্জুন বলল, "আচমকা আসতে হল। বিপদে পড়েছি একটু। আমাদের সঙ্গে একজন আমেরিকান মহিলা আছেন। তাঁর জন্য একটা থাকার জায়গা দরকার।"

"আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি ওখানে থাকলে কোনও সমস্যা হত না। একটু কথা বলে নিই...!"

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় অনিন্দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে নির্দেশ দিল লুসির থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। শুধু তাই নয় ,ওঁর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে যেন কোনও অযত্ন না হয়।"

লুসিকে সুন্দর গেস্টহাউজে তুলে দিয়ে অর্জুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করল, "বাইরের কেউ যেন ওঁর কাছে না ঘেঁষতে পারে। উনি এখানে আছেন, তা গোপন না রাখলে ওঁর ক্ষতি হবে।"

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বললেন, "কোনও চিন্তা করবেন না। এখানে উনি নিরাপদে থাকবেন। কিন্তু আপনারা কি এখানে থাকছেন না?"

"না। আমাদের ফিরে যেতে হবে হলং বাংলোয়।"

লুসিকে বিশ্রাম নিতে বললেন মেজর। বললেন, "বাংলোর বাইরে যেও না, অচেনা জায়গা। আমরা কাল সকালেই ফিরে আসছি।"

লুসির পক্ষে বাংলা বোঝা সম্ভব ছিল না। ইংরেজিতে যে ক'টা কথা হয়েছে, তা থেকে তিনি অনুমান করেছেন যা করবার। এখন মেজরের কথা শুনে প্রতিবাদ করলেন, "আমি বুঝতে চাই, আমাকে অর্জুন কী ভাবছেন? আমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই বোধ হয় এখানে থাকতে বলা হচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি অর্জুনের সঙ্গে থাকতে পার, তা হলে আমি পারব না কেন? আমি তোমার চেয়ে অনেক জোরে দৌড়তে পারি। আমার শরীরে শক্তি খুব কম নেই। শুধু মহিলা বলে যদি আমাকে তোমরা এখানে থাকতে বলো, তা হলে আমি তার প্রতিবাদ করছি।"

আমেরিকানরা যখন উত্তেজিত বা আবেগে আপ্লুত হয়ে কথা বলেন, তখন তাঁদের উচ্চারণ ঠিকঠাক বুঝতে পারা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্জুনের কানেও সব শব্দ অর্থবহ হয়ে উঠল না। মেজরেরও কথা বলার ধরন পালটে গেল। অভ্যস্ত আমেরিকান অ্যাকসেন্টে তিনি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে হাল ছাড়লেন। অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বললেন, "ও আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে। দ্যাখো, ওর সঙ্গে কথা বলে পার কিনা বোঝাতে!"

অর্জুন হাসল। ভারতীয় উচ্চারণে কেটে-কেটে সে কথা বলল, "লুসি, আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু ধরুন, আজ যদি আমার অথবা মেজরের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়, তা হলে ডক্টর মুলেনের গবেষণা থেমে থাকবে না। আপনার কিছু হলে সেটা আঘাত পাবে। তা ছাড়া বোঝাই যাচ্ছে, ওদের লক্ষ্য আপনি। তাই জেনেশুনে ওদের কাজটাকে সহজ করে দেওয়া কি ঠিক হবে?"

লুসি মাথা নাড়লেন, "কথাটায় যুক্তি আছে। কিন্তু ওরা তো আপনাকেও মেরে ফেলতে পারে। আপনি কেন জেনেশুনে ঝুঁকি নিচ্ছেন?"

"আমি একজন সত্যসন্ধানী। বিষ্টু সাহেব এবং মেজর আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে আপনি কাজ শেষ করে নিরাপদে ফিরে যেতে পারেন। আমি সেই দায়িত্ব পালন করছি। এটা আমার প্রফেশন," অর্জুন হাসল।

"প্রফেশন? তা হলে নিশ্চয়ই আপনি ফি নিচ্ছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি জানি না, আপনি ইন্ডিয়ান টাকায় কত ফি নিয়ে থাকেন!"

"এর জন্য তো মেজর আছেন। আমি কাজটাকেই গুরুত্ব দিই। টাকা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করি না। আচ্ছা, গুডনাইট।"

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের অনুরোধে ডাইনিং রুমে গিয়ে কিছু জলখাবার খেয়ে অর্জুনরা যখন বেরোল, তখন সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে।

পদমবাহাদুর বিড়বিড় করল, "এখানে রাতটা থাকলেই তো ভাল হত!"

অর্জুন বলল, "এখানে থাকা আর জলপাইগুড়িতে রাত কাটানো একই ব্যাপার।"

পদমবাহাদুর চুপ করে গেল।

গাড়ি চা-বাগান থেকে বেরোবার পর মেজর নড়েচড়ে বসলেন, "অর্জুন!"

"বলুন।" অর্জুন তাকাল।

"লুসির কথা শুনে মনে হচ্ছে ভুলটা আমারই। তোমার সম্মানদক্ষিণা কত তা জানা হয়নি। সেটা যাই হোক, ও নিয়ে কোনও চিন্তা কোরো না," মেজর বাইরে তাকালেন।

"কী আশ্চর্য! মেজর, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?" অর্জুন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

"না, কেন?"

"আপনার কাছে আমি টাকা চাইতে পারি? যা দেবেন, তাই মাথা পেতে নেব," অর্জুন বলল। সোজা জলদাপাড়ায় না গিয়ে মাদারিহাট বাজারের দিকে গাড়ি নিয়ে যেতে অর্জুন বলল পদমবাহাদুরকে। তখন বাজারের দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা পাঞ্জাবি ধাবার ভিতর আলো জ্বলছে। কিছু লোকজন তখনও রয়েছে দোকানে।

একটু আগে জলখাবার খাওয়ার কারণে মেজরের খাওয়ার ইচ্ছে নেই, অর্জুনেরও তাই। পদমবাহাদুরকে বলা হল রাতের খাবার খেয়ে নিতে। কিন্তু সে খেতে চাইল না এখন। বলল, খাবার প্যাকেটে নিয়ে বাংলোয় গিয়ে খাবে। মেজর তাকে ধমকালেন, ঠান্ডা হয়ে গেলে এসব খাবার খাওয়া যায় না। পদমবাহাদুর মাথা নাড়ল, ঠান্ডা খাবার খেতে সে অভ্যস্ত। অর্জুন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "কফি পাওয়া যাবে?"

"জি সাব।"

"দু'টো কফি দাও।"

মেজর বললেন, "চিনি-দুধ ছাড়া একটা।

"ভিতরে বসুন সাব।"

ছড়িয়েছিটিয়ে জনাআটেক লোক বিভিন্ন টেবিলে বসে খাচ্ছে। মেজর চেয়ারে বসে নাক টানলেন, "সেই গন্ধ! বুঝলে অর্জুন, এখানে হাঁড়িয়াও বিক্রি হয়।"

"হলেও সেটা আইনসম্মত নয়।"

"বুঝতে পারছি।"

"কী?"

"তোমার ওই পদমবাহাদুর, এখানে ডিনার করল না! আমাদের সামনে তো হাঁড়িয়া পান করতে পারবে না। আবার ডিনার করে ফেললে ভরা পেটে হাঁড়িয়া খেয়ে সুখ পাবে না। তাই বাংলোয় খাবার নিয়ে চলল। সেখানে গিয়ে জম্পেশ করে হাঁড়িয়া খেয়ে ডিনার সারবে। তখন খাবার ঠান্ডা না গরম, তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে!"

হঠাৎ কোনার টেবিল থেকে একটা রোগা লোক উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, "নমস্কার দাদা। আমাকে চিনতে পারছেন?"

লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। চোখ আধবোজা। কয়েক সেকেন্ডে মনে পড়ে গেল রূপমায়া সিনেমার ব্ল্যাকারদের একজন। থানার একজন এস আই খুব মারছিল একে। অর্জুন বাধা দিয়ে বলেছিল, "একে মেরে কী লাভ। পেটের দায়ে এই লোকটা কমিশনে কাজ করে। যে চক্র টিকিট ব্ল্যাক করায়, তাদের উচ্ছেদ করুন আগে। সেটা বন্ধ হলে এরা বিকল্প রোজগারের পথ ধরবে।" অর্জুনের কথায় যুক্তি ছিল। লোকটাকে ছেড়ে দিয়েছিল এস. আই.।

"মনে পড়েছে। তুমি এখানে? এখানে কি সিনেমা হল আছে?" অর্জুন তাকাল।

সঙ্গে-সঙ্গে জিভ বের করে নিজের কান ধরল লোকটা, "ছি ছি ছি। ওসব কবে ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আমাকে মার খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তারপর আর ও-লাইনে যাইনি। এই মাদারিহাটে ছোটখাটো ব্যবসা করছি আজ দু'বছর।"

"বাঃ ভাল।" কফি এসে যাওয়ায় সেদিকে তাকাল অর্জুন।

"কিন্তু আপনি দাদা এত রাতে এখানে?"

"কফি খেতে ঢুকলাম।"

"ও।" লোকটি সোজা হওয়ার চেষ্টা করল, "কোথায় উঠেছেন দাদা?"

"হলং ফরেস্ট বাংলোয়।"

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা চোখ বড় করে তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও মেমসাহেব নেই! তাই তো?"

অর্জুন কোনার টেবিলের দিকে তাকাল, "ওরা কারা?"

"এখানকার লোক।"

কফি যেটুকু খাওয়া গেল তাতেই খুব বিস্বাদ। পদমবাহাদুরের খাবার আর ওদের কফির দাম মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় অর্জুন দেখল, লোকটাও পিছন-পিছন আসছে। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে তোমার কাজ আছে?"

"এখন না। বারোটার পর...!"

"চলো, একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক। ভয় নেই, তোমাকে বারোটার আগেই এখানে নামিয়ে দেব। এসো।"

মেজরকে পদমবাহাদুরের পাশে বসতে বলে, লোকটাকে নিয়ে পিছনের সিটে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমার নামটা কী যেন!"

"সনাতন।"

পদমবাহাদুর গাড়ি চালু করলে সনাতন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"কোথাও না। একটু চক্কর মেরে আবার ফিরে আসব।"

"এসব জায়গা আঁধারে ভাল না দাদা।"

"কেন?"

"রাত বাড়লেই এখানে ধান্দাবাজি শুরু হয়ে যায়!"

"ও। এখন বলো তো, আমাদের সঙ্গে মেমসাহেব আছে কিনা কেন জিজ্ঞেস করছিলে?"

"কী বলব দাদা। এখানকার বাতাসে এখন একটাই খবর ভাসছে। হলং বাংলোয় একজন মেমসাহেব এসেছেন বাঙালিদের সঙ্গে, যাঁকে মেরে ফেললে দশ হাজার আর জ্যান্ত ধরে আনলে পঁচিশ হাজার পাওয়া যাবে," সনাতন বলল।

খবরটা কে ভাসাল?"

"জানি না। মুখে-মুখে চাউর হয়ে গেছে।"

"টাকাটা কে দেবে?"

সনাতন চুপ করে থাকল। হঠাৎ পদমবাহাদুর ড্রাইভিং সিটে বসেই গলা তুলে বলল, "ও মিথ্যে কথা বলছে সাব। এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।"

"তুমি ওকে চেনো?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"চিনব না? জলপাইগুড়িতে টিকিট ব্ল্যাক করেছে, মিনিবাসের খালাসির কাজ করেছে; ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চিৎকার করে কাস্টমার ধরে জোর করে টাকা নিতে গিয়ে রামধোলাইও খেয়েছে একবার। ওর বড় ছেলে আমার পাড়ায় থাকে। অথচ এখানে আমাকে দেখে এমন ভান করছে, যেন কোনওদিন দ্যাখেনি! সনাতন, সত্যি কথা বল সাবকে, না হলে তুই জলপাইগুড়িতে ঢুকতে পারবি না," পদমবাহাদুর চেঁচাল।

"আরে পদমদা নাকি! মাইরি বলছি, আঁধারে বুঝতেই পারিনি। তারপরে এক গলা হাঁড়িয়া খেয়ে চোখে ঝাপসা দেখছি...! বিশ্বাস করো।"

মেজর একটু নড়েচড়ে বসলেন। সম্ভবত হাঁড়িয়া শব্দটা কানে যেতেই তাঁর শরীর নড়ে উঠল।

অর্জুন বলল, "এখানে তুমি কোথায় থাকো?"

"একটা ঝুপড়িতে। দু'-তিনজন মিলে।"

"রাত বারোটায় তোমার কী কাজ থাকতে পারে?"

"একজনকে ফুন্টশোলিং পৌঁছতে হবে। ওই যারা আমার সঙ্গে বসেছিল, তাদের একজন ড্রাইভার। চারশো টাকা চেয়েছি। ওকে তিনশো দিতে হবে।"

"অত রাতে লোকটা কোত্থেকে আসবে?"

"জানি না দাদা। বলেছি ওই ধাবার সামনে আসতে। বিদেশি তো, তাই চিনতে অসুবিধে হবে না। আমি একটাও মিথ্যে বলছি না দাদা!"

"বিদেশি মানে? ভুটানি?"

"না, না। সাদা চামড়ার সাহেব।"

"কোন দেশের?"

"তা জানি না দাদা।"

"সেই সাহেবের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, মানে, না দাদা!"

পদমবাহাদুর বলল, "বহুত জালি আদমি হ্যায়।"

"লোক দু'টো শিলিগুড়িতে থাকে। বীরপাড়া থেকে প্রীতমের গাড়ি ভাড়া করে এখানে এসেছে। শিলিগুড়ির মাইকেল সাহেবের লোক।"

মাইকেল! ঝাপসা মনে এল নামটা। শিলিগুড়ি মূলত মাফিয়াদের শহর। আর এই মাফিয়াদের নেতা এত দ্রুত বদলায় যে, তাল রাখা মুশকিল। কিন্তু ওই মাইকেল নামটা যেন বেশ কিছুদিন ধরে অর্জুন শুনছে।

পদমবাহাদুর জিজ্ঞেস করল, "সাব, গেটে এসে গিয়েছি।"

"ভিতরে চলো।"

পদমবাহাদুর গাড়ি থেকে নেমে গেটের রক্ষীদের কাছে গিয়ে কাগজপত্র দেখিয়ে সইসাবুদ করলে গেট খুলল। সেই সময় প্রহরীদের একজন জিজ্ঞেস করল, "কিতনা আদমি হ্যায়?"

"আমাকে নিয়ে চারজন," পদমবাহাদুর জবাব দিল।

"তো ঠিক হ্যায়।"

গাড়ির ভিতর যে অন্ধকার, তা দরজা খোলা-বন্ধের সময় আলো জ্বলে উঠতেই উধাও হচ্ছিল। অর্জুন সে সময় সনাতনের মাথাটা নীচে নামিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। গাড়ি চলতে শুরু করলে সনাতন ককিয়ে উঠল, "এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?"

"কোথায় যাচ্ছি তা তো বুঝতেই পারছ!" অর্জুন বলল।

"কিন্তু হলং বাংলোয় গিয়ে আমি কী করব? ওখান থেকে রাতের বেলা বেরোতে পারব না। হায়, হায়, আমার একশো টাকা চোট হয়ে যাবে আজ।"

"চোট হলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব। তা ছাড়া বলেছি তো, বারোটার আগেই তোমাকে পৌঁছে দেব। এখন বলো, টাকাটা কার কাছে পাওয়া যাবে!"

"সত্যি বলছি...!"

বাধা দিল অর্জুন, "ওই হলং বাংলোয় একজন আমেরিকান মেমসাহেব আছেন। আমি ওঁকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু কেন দেব? তুমি তো নিজেই পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে!"

"কোন বদমাশ হাওয়া হবে? আমি বেইমান নই দাদা। আপনি যদি ওকে ধরে জঙ্গল থেকে বের করে দিতে পারেন, তা হলে আপনার অর্ধেক, আমার অর্ধেক।"

"অসম্ভব। আমার পনেরো, তোমার দশ।"

"বেশ, ঠিক হ্যায়। কবে পারবেন?"

"কবে মানে? এসব কেসে কেউ দেরি করে? লোক নেমে গেছে, দেখব আমি কিছু করার আগেই কেউ ওকে হাওয়া করে দিয়েছে," অর্জুন বলল।

"ঠিক কথা। ওরা আজ চেষ্টা করবেই।"

"কারা?"

"শিলিগুড়ির লোক দু'টো। জ্যান্ত না আনতে পারলে মেরে ফেলবে।"

"সেটা আমি হতে দিচ্ছি না সনাতন। কিন্তু টাকাটা পাওয়া যাবে

boiRboi.net

তো?"

"আমার উপর ছেড়ে দিন। মাল না দিলে ডেলিভারি দেব না।"

"কিন্তু কে মাল দেবে?"

"কেন? শিলিগুড়ির লোক দু'টো যার জন্য খাটছে, সে!"

"ওই বিদেশি ভদ্রলোক?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কী করে জানলে?"

"দাদা, হাওয়ায় কথা ভাসে!"

"চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। লোকটা কোথায় উঠেছে?"

"আমি জানি না দাদা। আমাদের সঙ্গে একবারও দেখা করেনি। শিলিগুড়ির লোক দু'টোই কথা বলতে এসেছে," সনাতন বলল।

"ট্রানজিটের খাঁচা ভেঙে সাপটাকে কে বের করেছে?"

"সাপ? কী সাপ?"

"তুমি শোনোনি, ফরেস্টের খাঁচা থেকে একটা সাপ চুরি করা হয়েছে?"

"না দাদা। কবে হয়েছে?"

অর্জুন চুপ করে গেল। হয় লোকটা মিথ্যে বলছে, নয় সত্যি জানে না। কিন্তু এখানে থাকলে না জানার কোনও কারণ নেই। ছোট্ট জায়গা, এত বড় খবর না জেনে উপায় নেই। একে নিয়ে কী করা যায় ভাবছিল অর্জুন।

হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি থামাল পদমবাহাদুর। অর্জুন দেখল, তাদের গাড়ির হেডলাইটের সামনে একটা বিশাল চেহারার হাতি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকেই মুখ করে।

অর্জুন চাপা গলায় বলল, "হেডলাইট, সাইডলাইট সব নিভিয়ে দাও।"

আলো নিভে যাওয়ামাত্র মেজরের মন্তব্য শোনা গেল, "ভয়ংকর ভাল।"

পদমবাহাদুর নিচু স্বরে বলল, "কথা বলবেন না।"

"ঠিক আছে," মেজর গলা নামালেন, "কিন্তু ওটা ওখানে কী করছে?"

কাকতালীয়ভাবে হাতিটা শুঁড় তুলে গর্জন করতেই বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে পিলপিল করে বাচ্চা-বড় হাতির পাল বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকে যেতে লাগল। নেতা হাতিটি একপা'ও নড়েনি। ঠায় চেয়েছিল গাড়ির দিকে। দলের শেষ সদস্য জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার পর সে বিজয়ীর ভঙ্গিতে পা বাড়াল। তারও মিনিটপাঁচেক পরে আবার হেডলাইট জ্বালাল পদমবাহাদুর।

সনাতন বলল, "রাখে হরি মারে কে? গত মাসে চাপড়ামারিতে হেডলাইট জ্বলতে দেখে গাড়ি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল হাতিরা।

বাংলোর সামনে গাড়ি থেকে নামতেই সেই রোগা লোকটাকে দেখতে পাওয়া গেল। কাছাকাছি যেতে অর্জুন দেখল, লোকটি সনাতনকে দেখে খুব অবাক হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, "একে চেনো?"

না বলতে গিয়েও, হ্যাঁ বলল লোকটা।

"আমি যেখান থেকে হাঁড়িয়া কিনি, কাল ও সেখান থেকে হাঁড়িয়া কিনে এনেছে। ঠিক আছে দাদা, আপনারা যান, আমি ওর সঙ্গে গল্প করি। কিন্তু জোর করে এত দূরে নিয়ে এলেন, বারোটার মধ্যে ফিরব কী করে ভাবছি," সনাতন কথাগুলো বলতে-বলতে এগোচ্ছিল।

অর্জুন বলল, "চিন্তা কোরো না। যেখানেই যাও, এগারোটার মধ্যে ফিরে এসো। তোমাকে পৌঁছবার দায়িত্ব আমি তো নিয়েছি।"

সনাতন বিড়বিড় করল, "এই অন্ধকারে কোথায় যাব!" তারপর রোগা লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই, লছমন কোথায় রে?" ধাবায় যখন সে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন ওর কথা জড়ানো ছিল। এখন পরিষ্কার।

"কী জানি," লোকটা উদাস গলায় বলল।

"চলো, খুঁজে বের করি!"

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে অর্জুনের ঘরে ঢুকে মেজর অনেকক্ষণ পরে কথা বললেন, "কী বুঝছ?" চেয়ার টেনে ধপ করে শরীর ছেড়ে দিলেন তিনি।

"কিছু বুঝতে পেরেছি বলা এই মুহূর্তে ভুল হবে।"

"কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি। নিউ ইয়র্কের মাফিয়াদের এত ক্ষমতা যে, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি-জলদাপাড়াতেও স্বচ্ছন্দে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে!" মেজর বললেন।

"এদের নেটওয়ার্ক খুব ভাল। কিন্তু লুসিকে মেরে ফেলাই যদি ওদের উদ্দেশ্য, তা হলে গত কালই তো মেরে ফেলতে পারত। আজও প্রচুর সুযোগ পেয়েছে। মারছে না কেন?"

"আমরা সব সময় ওর পাশে থাকছি, তাই সাহস পাচ্ছে না!" মেজর বললেন।

"দুর! আজ সকালে যখন আপনারা হাতির পিঠে চেপে ঘুরতে গিয়েছিলেন, তখনই জঙ্গলের ভিতর ওকে শেষ করে দিতে পারত।"

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ, লুসি ওদের টার্গেট নয়?"

"না।"

"তা হলে কি...!"

"না, আপনিও নন।"

"যাচ্চলে! তা হলে?"

"শুয়ে পড়ুন। একটু পরেই তো বেরোতে হবে।"

"আমি একবার শুলে আর উঠতে পারব না ভাই। তা ছাড়া কোথায় শোব? মাঝখানের ঘরে অবশ্য শোওয়া যায়। আজ লুসি নেই," মেজর উঠে দাঁড়ালেন।

"চলুন, লুসির ঘরে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"নো, নো। তুমি আমার ফর্ম ভুলে যাচ্ছ। একা-একা কোয়ার্টার সহারা পেরিয়ে গিয়েছি, এ তো এ ঘর থেকে ও ঘর," বলতে-বলতে পাশের ঘরে চলে এলেন তিনি। ভেজানো দরজা ঠেলে আলো জ্বেলে চট করে ঘরটা দেখে নিয়ে সোজা বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন জেমস বন্ডের মতো। তারপর খাটের তলা, আলমারি দেখে নিয়ে বললেন, "ওকে। কিন্তু মেয়েটা যে খাটের উপর পোশাক ছড়িয়ে গিয়েছে।"

অর্জুন সেগুলোকে টেবিলে তুলে দিল, "এমন কিছু গরম নেই, জানলা খুলবেন না।"

"পাগল!"

অর্জুন ঘর থেকে বেরোতে যাবে, হঠাৎ মোবাইলের রিং শুনতে পেল। সে পকেট থেকে নিজের সেট বের করে দেখল সেটি অন্ধকার।

"আপনার মোবাইল বাজছে?"

"নো, আমি ওই যন্ত্রটি ব্যবহার করি না।"

ইতিমধ্যে শব্দটি থেমে গেল। অর্জুন চারপাশে লক্ষ করছিল। যেদিক থেকে শব্দটি ভেসে এসেছিল, সেদিকে লুসির ঢাউস সুটকেস পড়ে আছে। তবে কি মোবাইলটা লুসির? সুটকেসে রেখে গিয়েছে? সে বলল, "মনে হচ্ছে লুসির মোবাইলে কল এসেছিল। ওটা সুটকেসের ভিতর রয়েছে।"

"থেমে গিয়েছে যখন, তখন ওটার কথা ভুলে যাও। মহিলাদের সুটকেস খোলা অভদ্রতা," খাটের উপর বসলেন মেজর।

ঠিক তখনই জলতরঙ্গ বাজল সুটকেসের মোবাইলে। ভারতবর্ষের কেউ নিশ্চয়ই লুসিকে কোনও খবর পাঠাতে চাইছে না। জলতরঙ্গ একবার বেজে থেমে যাওয়ার অর্থ হল মেসেজ এসেছে।

"বিদেশের কেউ নিশ্চয়ই কিছু জানাতে চায় লুসিকে। সেটা খুব জরুরিও হতে পারে।"

অর্জুন বলল কথাটা। মেজর মাথা নাড়লেন, "হতে পারে। তা হলে বের করো ওটা।"

সুটকেস খুলতেই মোবাইল সেটটাকে দেখতে পেল। বেশ দামি সেট। সঙ্গে ক্যামেরা তো আছেই, আরও অন্যান্য আধুনিক সুবিধেতে ঠাসা। পরদায় ফুটে উঠেছে, একটি মেসেজ এসেছে। বোতাম টিপে লক খুলে মেসেজ ইনবক্সে গেল অর্জুন। বোতাম টিপতে ফুটে উঠল ইংরেজি অক্ষরগুলো, "এক্সলেন্ট ওয়ার্ক। ডোন্ট ক্যারি ক্যাসেটস, ট্রাই টু ফাইন্ড এ কুরিয়ার সার্ভিস। কিপ ডিসট্যান্স উইথ দ্য টার্গেট নম্বর ওয়ান। কাম ব্যাক সুন।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যক্তিগত ব্যাপার?"

"হয়তো। শুধু একটা কথা বুঝতে পারছি না," মোবাইলটা মেজরকে দিল অর্জুন। মেজর চেঁচিয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, "বেশ রহস্যময় মেসেজ। লুসিকে বলা হয়েছে, ক্যাসেটগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে এবং টার্গেট নম্বর ওয়ানের থেকে দূরত্বে থাকতে। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতেও বলেছে। জানা দরকার, মেসেজটা কে পাঠিয়েছে?"

অর্জুন মোবাইল সেট হাতে নিয়ে বোতাম টিপে বলল, "প্রাইভেট নম্বর। যে পাঠিয়েছে তাকে শুধু লুসিই জানেন।" বলতে-বলতে মনে পড়ে গেল, তার মস্তিষ্কে যখন খবর আসে, তখন মোবাইলে ফুটে ওঠে প্রাইভেট নম্বর। পরে জানা গিয়েছে বিষ্টুসাহেব কথা বলেছেন। তা হলে কি এই মেসেজ বিষ্টুসাহেবই পাঠিয়েছেন?

কিন্তু তা হলে কাকে টার্গেট নম্বর ওয়ান বলেছেন? দূরত্ব রাখতে বলেছেন যখন, তখন সেই টার্গেট নম্বর ওয়ান ওঁর সঙ্গেই আছে? সঙ্গী বলতে তো মেজর এবং সে! অর্জুন ফাঁপরে পড়ল।

টার্গেট নম্বর ওয়ান! কার টার্গেট? হঠাৎ মনে হল গত রাতে যারা সাপটাকে ছুড়েছিল জানলা দিয়ে, তাদের টার্গেট কি মেজরই ছিলেন? ওরা ভুল ভেবেছিল? লুসি নন, মেজরই টার্গেট নম্বর ওয়ান? সেই কারণে লুসিকে একা পেয়েও মেরে ফেলেনি ওরা!

অথচ সনাতনের কাছে খবর, লুসিকে মেরে ফেললে দশ, ধরে নিয়ে গেলে পঁচিশ পাওয়া যাবে। এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে লুসিরই টার্গেট হওয়া উচিত। কিন্তু এই মেসেজ লুসিকে সতর্ক করে বলছে, টার্গেট থেকে দূরে থাকতে! অর্জুনের মনে হল, লুসির সঙ্গে কথা বললে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। সে সন্তর্পণে মোবাইল সেটটাকে সুটকেসের যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই রেখে দিল। রাখার আগে বোতাম টিপে আগের অবস্থায় মোবাইলটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। অর্জুন মেজরকে বলল, "লুসির যে মেসেজ এসেছে তা বলবার দরকার নেই।"

"কেন?"

"দেখুন না, উনি নিজে থেকে কিছু বলেন কিনা!"

অর্জুন নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুতেই তার মোবাইল বেজে উঠল, একটা মেসেজ এসেছে। রোমানে লেখা, 'হাবুর কী মোবাইল আছে? থাকলে তার নম্বর এখনই এস এম এস করো। বিষ্টুসাহেব।'

অবাক হল অর্জুন। হাবু কথা বলতে পারে না। মোবাইলের প্রয়োজন ওর নেই। তা ছাড়া একটা মোবাইল কেনার ক্ষমতা বাড়ির কাজের লোক হাবুর থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও বিষ্টুসাহেব হাবুর মোবাইল নম্বর জানাতে বললেন? ওঁর তো অজানা নয় যে, হাবু মূক-বধির। তারপরই প্রশ্নটা মাথায় এল। যদি হাবুর মোবাইল থাকত, তা হলে সে কোনও নম্বরে এস এম এস পাঠালে, বিষ্টুসাহেব সেটা পেতেন। বিষ্টুসাহেবের এস এম এস এসেছে একটা প্রাইভেট নম্বর থেকে। কোনও নম্বর লেখা নেই। শুধু লেখা রয়েছে প্রাইভেট নম্বর। তবু মেসেজের ইনবক্সে গিয়ে বোতাম টিপে সে রিপ্লাই-এ চলে এল। তারপর লিখল, 'হাবুর মোবাইল নেই।' বোতাম টিপতেই সেন্ড ফুটে উঠল। সেন্ড টিপলে জানতে চাইল কোন নম্বরে মেসেজ পাঠাতে হবে? অর্জুন নম্বরের জায়গায় লিখল, 'প্রাইভেট নম্বর।' পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে লেখা ফুটে উঠল, 'মেসেজ ফেলড।'

বিষ্টুসাহেব নিশ্চয়ই জানেন, তিনি প্রাইভেট নম্বর থেকে ফোন করছেন। তা হলে কী করে তাকে এস এম এস করতে বললেন?

হঠাৎ অর্জুনের খেয়াল হল। জলপাইগুড়ি থেকে আসার পর আর মা'র খবর নেওয়া হয়নি। সে নিজের বাড়ির নম্বর টিপল। মায়ের ঘুমনোর সময় এখনও হয়নি। রিং হচ্ছিল। শেষে মা'র গলা পাওয়া গেল, "হ্যালো।"

"কেমন আছ তুমি?"

"তুই? কী ছেলে রে বাবা। সেই যে গেলি, একটাও খবর নিলি না!"

"সরি মা। এত ঝামেলায় আছি, তুমিও তো মোবাইলে ফোন করোনি?"

"করিনি? করে-করে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। লাইনই পাইনি। তুই কবে আসছিস? ওরা কেমন আছে?"

"ওঁরা ভাল আছেন। কবে আসছি এখনই বলতে পারছি না।"

"এদিকে একটা খারাপ খবর আছে।"

"কী খবর?"

"কাল শেষ রাতে হাবুকে পাড়ার লোকজন হাসপাতালে ভর্তি করেছে।"

"হাবুকে? কেন? কী হয়েছে ওর?"

"ও বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। হাবুর হাত-পা বেঁধে ডাকাতরা তার দিয়ে কীসব করছিল। সেই অবস্থায় হাবু লড়াই করায় ওরা ওকে গুলি করে। গুলির শব্দে পাড়ার লোক উঠে পড়ার সময় ডাকাতরা পালিয়ে যায়।"

"হাবু কেমন আছে এখন?"

"আমি বিকেলে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। আই সি ইউ-তে রেখেছে। অপারেশন করে গুলি বের করেছে। কী হবে তা এখনই ডাক্তাররা বলতে পারছেন না।"

"ঠিক কখন ডাকাতি হয়েছে?"

"তা জানি না। গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে ভোর চারটের সময়। ওরা নাকি একটা জিপে চেপে এসেছিল।"

"মা, তুমি ডাক্তারদের বলো, চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। টাকাপয়সার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হাবুকে বাঁচাতেই হবে," অর্জুন বলল।

"তুই এটা বলবি তা জানা থাকায় আজই আমি ডাক্তারদের বলে এসেছি। ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। যদি দরকার মনে করেন, তা হলে হাবুকে ওঁরা নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাবেন। তুই চিন্তা করিস না।"

"ঠিক আছে মা, রাখছি," মোবাইল বন্ধ করল অর্জুন।

অমল সোম হাবুর উপর বাড়ির দায়িত্ব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রতি মাসে টাকা পাঠাতেন হাবুর নামে, যাতে সে নিজের খরচ এবং বাড়ির দেখাশোনা করতে পারে। কিন্তু ওই বাড়িতে যে ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়ার মতো কিছু নেই, এ খবর জলপাইগুড়ির অধিকাংশ মানুষ জানে। তা হলে ডাকাতি করতে কারা গিয়েছিল? লোকগুলো যে নির্বোধ, তা ভাবা যাচ্ছে না। ওরা হাবুকে বেঁধে তার দিয়ে কী করছিল?

মাথায় ঢুকছিল না অর্জুনের। এই সময় নীচে বেশ গোলমাল হচ্ছে বলে সে বুঝতে পেরে পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সনাতনের সঙ্গে যে লোকটা ঝগড়া করতে-করতে শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পৌঁছোল, তার মুখ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তৃতীয় লোকটি, যে কিনা দর্শক, তাকে চিনতে অসুবিধে হল না।

অর্জুন ধমক দিল, "অ্যাই! কী করছ তোমরা?"

"সার, এই লোকটা আমার টাকা মেরে দিচ্ছে," মুখ তুলে যে বলল

তাকে চিনতে পারল অর্জুন, লছমন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী। আজ ওকে জঙ্গলে দেখেছে।

"না, দাদা। আমি বলেছি বাকি থাকবে। কাল দিয়ে দেব।"

"আমি আগেই বলেছি হাঁড়িয়া আমি বাকিতে দিই না। তারপর খেলি কেন? কাল টাকা আদায় করতে কোথায় ছুটব আমি? টাকা দে, নইলে তোকে এই জঙ্গল থেকে বেরোতে দেব না।"

"বেরোতে দিবি না? কেন, কী করবি তুই?"

"মরে যাবি সনাতন। গন্ডার লেলিয়ে দেব পিছনে।"

"গন্ডার? গন্ডাররা তোর চাকর নাকি? হা হা হা!"

"সাব, আমাকে দোষ দেবেন না পরে," লোকটা মুখ তুলল।

"কত টাকা পাওনা হয়েছে তোমার?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"তিরিশ টাকা।"

"তুমি একজন সরকারি কর্মী হয়েও ওসব বিক্রি করছ কোন সাহসে?"

"সাব, আমি বিক্রি না করলে বড়সাহেবরা এখানে এলে অসুবিধেয় পড়তেন। সত্যি বলছি সাব, আমি বেশি দাম নিই না। কাল টুরিস্ট সাহেবের জন্য ও হাঁড়িয়া কিনতে গিয়েছিল আমার কাছে। আমি এক নম্বর জিনিস দিয়েছি, মাত্র পাঁচ টাকা প্রফিট করে। একে আমি ছাড়ব না!"

"কী করে গন্ডার লেলিয়ে দেবে?"

"আমি ডাকলে গন্ডার ছুটে আসবে, ওকে ছাতু করে ফেলবে।"

"তুমি উপরে এসো।"

সনাতনকে শাসাতে-শাসাতে লছমন উপরে উঠে এল। লোকটাও যে নেশা করেছে, বোঝা যাচ্ছিল। সে দরজায় দাঁড়াতে অর্জুন বলল, "দ্যাখো, তোমার যে ক্ষমতা আছে তা আমার নেই। তোমার ডাক গন্ডার শোনে, আমি হাজার ডাকলেও তারা কান দেবে না। ভগবান তোমাকে এত ক্ষমতা দিয়েছেন যখন, তখন তুমি এদের সঙ্গে ঝগড়া করছ কেন? আমার কাছে থেকে টাকাটা নিয়ে নিও।"

"ও ব্যাটা বদমাশ। এখানে কেন এসেছে জানেন? ধান্দায়। ও তো জানে না যে, মেমসাহেব এখন বাংলোয় নেই। ওরা জানে তাকে ধরে দিতে পারলেই পঁচিশ হাজার পেয়ে যাবে। আরে, এতই যদি সোজা হত, তা হলে আমি কি মরে গিয়েছি? এটা আমার এলাকা। আমি কামাই না করে তোদের কামাই করতে দেব? সাব, শুধু গন্ডার কেন, হাতিও আমার কথা শোনে। মাহুতকে জিজ্ঞেস করুন।" কথা বলতে-বলতে টলছিল লছমন।

"শুনেছি এই জঙ্গলে বিষধর সাপ অনেক আছে।"

"সাপ? সাপ আমাকে ভয় পায়। একবার একটা কেউটে ভয় পেয়েই ছোবল মেরেছিল আমাকে। আমি মরলাম না, সাপটাই মরে গেল," সোজা হওয়ার চেষ্টা করল লছমন, "তা হলে আপনিই টাকাটা দিয়ে দেবেন? এখনই দিন না।"

"কেন? আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না?"

জিভ বের করে নিজের কান স্পর্শ করল লছমন, "ছি, ছি। কী বলেন! তবে সাব, মানুষের জীবন তো, কিছুই বলা যায় না। রাতে যার সঙ্গে কথা বললাম, সকালে তাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হল শ্মশানে।"

"আমি অত সহজে মরব না লছমন। কাল যে সাপটাকে ট্রানজিট থেকে চুরি করে নিয়ে জানলা দিয়ে ঘরে ফেলা হয়েছিল, সেটাও তো কাউকে মারতে পারেনি। লছমন, সময়টা বলো, ঠিক কোন সময়ে সাপটাকে ছুড়েছিলে!" অর্জুন তাকাল।

লছমন পিটপিট করে তাকাল। অর্জুন লোকটাকে ভাল করে দেখছিল। দেখতে পেল সেই ভরদুপুরে কানের পাশে গুঁজে রাখা সিগারেটটা এখনও স্থানচ্যুত হয়নি। হয়তো ওটার কথা ভুলেই গিয়েছে লোকটা। সে এগিয়ে গিয়ে হতভম্ব লছমনের কানের পাশ থেকে সিগারেটটা টেনে বের করে আলোর সামনে ধরল, ডানহিল। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি নিশ্চয়ই প্যাকেট খুলে নিজের জন্য একটা সিগারেট বের করে কানে গুঁজে রাখোনি? এর প্যাকেট কত দামে বিক্রি করো?"

"একশো টাকা।"

"কত করে কেনো?"

"সাপ্লাই বেশি এলে দাম কমে যায়। সব সময় ঠিক থাকে না।"

"ওই একটা সিগারেট কে দিয়েছে তোমাকে?"

"আপনি কী জানতে চাইছেন?" হঠাৎ লছমনের গলার স্বর নরম হয়ে গেল।

"সাপটা কি তুমি ছুড়েছিলে?"

"না, আমি ছুড়লে ওটা কাজে লাগত।"

"কী কাজ? মেজর না লুসিকে মেরে ফেলা?"

"আমি কিছু জানি না। মাইকেলসাহেবের লোক এসেছিল। আমার কাছে একটা মই চাইল, দিলাম। ওরা অন্ধকারে কী করেছে দেখতে পাইনি। পরে শুনেছিলাম, ওরা সাপ ছুড়েছিল মারতে। জানে না কায়দা। ছোড়ার সময় যদি লেজটা মুচড়ে দিত, তা হলে বিছানায় পড়েই ফণা তুলে ছোবল মারত। তা করেনি বলে ভয়ে লুকোতে চেষ্টা করেছে।"

"মাইকেলসাহেব কে?"

"ওরে বাবা। শিলিগুড়ির অর্ধেক এলাকার মালিক। দু'শো জন ওর আন্ডারে কাজ করে। পুলিশ আজ পর্যন্ত মাইকেলকে ধরতে পারেনি। যখন-তখন হিলকার্ট রোডে, চার-পাঁচজনের বডি ফেলে দিতে পারে। কাল রাতে মই না দিলে আমিই খতম হয়ে যেতাম," লছমন বলল, "গুডনাইট সাব।"

"দাঁড়াও। আজ দুপুরে মাদারিহাট থেকে চোরাপথে খুব খুশিমনে ফিরে এসেছ। ভাল কামাই হয়েছে?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আ-আপনি জানলেন কী করে?"

"যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।"

"হ্যাঁ। সাহেব বলেছে দশ বোতল স্কচ আমাকে দেবে, দাম দিতে হবে না। দশ বোতলের দাম এখানে অন্তত কুড়ি হাজার টাকা হবে। তাই...।"

"কোন সাহেব?"

"নাম জানি না। মাইকেলের লোক দু'টো আমাকে সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা। তোমাকে দশটা স্কচ সাহেব উপহার দেবে, এমনই-এমনই?"

"তা বলতে পারেন। জঙ্গলের নিয়ম হল, রাতে কোনও গাড়ি বের হবে না, ঢুকবে না। এমার্জেন্সি হলে আলাদা কথা। রাতে জঙ্গলের পথে হাঁটাও বেআইনি। সাহেবের ইচ্ছে, রাত একটা নাগাদ জঙ্গলে ঢুকে গন্ডারদের ছবি তুলবেন। আমি ডাকলে গন্ডাররা আসবে। সেই সুযোগ করে দিলে, সাহেবের ছবি তুলতে সুবিধে হবে। তার জন্যই উনি আমাকে উপহার দিচ্ছেন," লছমন কপালে হাত ছোঁয়াল, "জঙ্গলে ঢোকা আটকাতে গার্ড আছে। ওটা আমার কাজ না। তাদের ম্যানেজ করে যদি সাহেব ভিতরে আসতে পারে, তা হলে আমি ওই উপকারটা করেই দিতে পারি। এতে তো কারও ক্ষতি হবে না।"

"কিন্তু সনাতন বলল, সাহেব ওর কাছ থেকে লরি নিয়ে ফুন্টশোলিং চলে যাবেন বারোটার সময়," অর্জুন মনে করিয়ে দিল।

"আমি জানি না। সাহেব এসে মাল দেবে, আমি কাজ করে দেব। আচ্ছা," লছমন চলে গেল।

বারোটার কিছু আগে অর্জুন নীচে নামল। পদমবাহাদুর গাড়িতেই ঘুমোচ্ছে। চারধার পাতলা অন্ধকারে ঢাকা। জোনাকি উড়ল জঙ্গলের গায়ে। ওপাশের বাংলোর স্টাফ কোয়ার্টার্সে আলো জ্বলছে না। একটা

দরজায় শব্দ করল অর্জুন। অনেকক্ষণ পরে হারিকেন হাতে রোগা লোকটা বেরিয়ে এল।

"সনাতন কোথায়?"

"ও তো চলে গিয়েছে।"

"চলে গিয়েছে? হেঁটে-হেঁটে?"

"তা জানি না। লছমন যখন উপরে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল, তখনই চুপচাপ চলে গেল।"

"ঠিক আছে, শুয়ে পড়ো।"

উপরে উঠে এল অর্জুন। সনাতন বোধ হয় তার উপর ভরসা করতে পারেনি। কিন্তু এত রাতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যে বিপজ্জনক, তা নিশ্চয়ই ও জানে। তবু ঝুঁকি নিল!

হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, আর নয়, অনেক হয়েছে। লুসি প্রচুর পাখির ডাক রেকর্ড করেছেন। কাল সকালে জলপাইগুড়ি যাওয়া দরকার। হাবুকে সুস্থ করে তোলাই তার এখন একমাত্র কাজ।

হাবুকে মারতে চাইল কেন? কারা মারতে চেয়েছিল? আর আজই বিষ্টুসাহেব জানতে চাইলেন হাবুর মোবাইল নম্বর কত। হাবু কি ওদের টার্গেট ছিল? কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে লুসি তো হাবুর ধারেকাছে কখনও ছিলেন না। হঠাৎ মনে হল, লুসিকে যে মেসেজ পাঠিয়েছে, সে টার্গেট বলতে তাকে বোঝায়নি তো! আর এটা লুসির জানা। অথচ লুসির কথাবার্তা বা ব্যবহারে সেটা একদম বোঝা যায়নি।

অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। অর্জুন বুঝতে পারছিল, এই বাংলোয় থাকা আর নিরাপদ নয়। দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে মেজরের ঘরে গেল। দরজা না বন্ধ করে শুয়েছেন মেজর। ঘরে ঢুকে তাঁকে ডাকতেই তিনি উঠে বসলেন।

"একি! আপনি ঘুমোননি?"

"ঘুমিয়েছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল।"

"তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র প্যাক করে নিন।"

"কেন?"

"আমাদের এখনই বাংলো ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

"চলে যেতে হবে? মাঝরাতে চলে যেতে বললেই হল? মামদোবাজি? ডাকো রেঞ্জারকে, ওর বাবার নাম আমি ভুলিয়ে দেব!" মেজর খেপে গেলেন।

"কেউ আমাদের চলে যেতে বলেনি। আত্মরক্ষার জন্য আমরা চলে যাব।"

"ও, তাই বলো। এটা রণকৌশল।"

ঝটপট রেডি হয়ে নিয়ে মেজর নীচে নামলেন। অর্জুন গাড়ির কাছে গিয়ে জানলায় শব্দ করতে পদমবাহাদুর জিজ্ঞেস করল, "কৌন?"

অর্জুন বলল, "চুপচাপ বেরিয়ে এসো।"

বিস্মিত পদমবাহাদুর দরজা খুলে বলল, "সাব?"

"গাড়িটাকে ভালভাবে লক করে আমাদের সঙ্গে চলো।"

পদমবাহাদুর কথা বাড়াল না।

নিঃশব্দে রেঞ্জারের অফিস ছাড়িয়ে ওরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। মেজর বললেন, "গাড়িটাকে নিয়ে এলে না কেন? অন্ধকারে হাঁটা যাচ্ছে না।"

দুপুরের সেই কাঁচা রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে অর্জুন দেখল, আকাশ অনেকটাই ঢেকে গিয়েছে বড়-বড় গাছের পাতায়। নিচু গলায় বলল, "গাড়িটাকে ওখান থেকে সরালে ওরা সন্দেহ করত।"

"কারা?"

"যারা আমাকে মারতে চায়!"

"তোমাকে? কী বলছ? কারা মারতে চায়?"

"যারা চাইছে না প্রোফেসর মুলেনের গবেষণা সফল হোক। আসুন, আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাই। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না।"

জঙ্গলের মধ্যে একটা চমৎকার বসার জায়গা পেয়ে গেল ওরা। বেশ বড়-বড় বোল্ডার পড়েছিল ওখানে। এখানে আকাশ অনেকটাই দৃশ্যমান বলে ফিনফিনে আলো অন্ধকারকে পাতলা করেছে।

লছমনের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে ওদের এই পথ দিয়েই আসতে হবে। এত রাতে মূল গেট কখনওই খুলবে না। হঠাৎ মাথার ভিতরে অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল অর্জুনের। তারপরই বিপ বিপ শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গে মোবাইলের আলো জ্বলে উঠল। ফুটে উঠল, 'প্রাইভেট নম্বর।'

পরিষ্কার ইংরেজিতে বলা কথাগুলো মস্তিষ্ক গ্রহণ করল, "অর্জুন, ডু ইউ হিয়ার মি? লুসি কি তোমার কাছে আছে? আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই. আমি প্রোফেসর মুলেন। যদি থাকে, তা হলে তোমাকে যে কথাগুলো বলব, তা ওকে বলে দিও। যদি না থাকে, তা হলে তোমার মোবাইল সেট অফ করে দিও।"

অফ করে দেওয়াই উচিত। কিন্তু অর্জুন সেটা করল না।

"তা হলে লুসি তোমার পাশেই আছে। লুসিকে জিজ্ঞেস করো, ও কি মোবাইল নিয়ে যায়নি? উত্তরটা হ্যাঁ হলে তোমার মোবাইল অফ কোরো না।" কয়েক সেকেন্ড গেল, প্রোফেসর মুলেন আবার কথা বললেন, "আশ্চর্য। এই কারণে আমি ওর কাছে পৌঁছতে পারছি না। যা হোক, লুসিকে বলো, বিপ বিপ করে যে পাখি ডাকে, তার দেখা পেলে যেন অবশ্যই একটা ছবি তুলে নিয়ে আসে। আর আসার সময়টা আমাকে যেন আগেই জানিয়ে দেয়।"

তারপর মাথার ভিতর ঝিমঝিম করে উঠল অর্জুনের, মোবাইলের আলো নিভে গেল। আজ মাথার অস্বস্তি দূর হয়ে গেল বেশ তাড়াতাড়ি। কিন্তু ব্যাপারটা কী? লুসি তো মোবাইল নিয়ে এসেছেন। সেই মোবাইলে মেসেজও আসছে। অথচ ওঁর বস প্রোফেসর মুলেন মনে করছেন, লুসি মোবাইল নিয়ে আসেননি। তা হলে এটা কি অন্য মোবাইল, যার নম্বর প্রোফেসরকে দিয়ে আসেননি লুসি! তা হলে তো...!

হঠাৎ একটা চাপা যান্ত্রিক শব্দ কানে এল। মেজর ফিসফিস করে বললেন, "মনে হচ্ছে, একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ।"

মিনিটতিনেকের মধ্যে ওরা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে জিপটাকে দেখতে পেল। নাচতে-নাচতে এগোচ্ছে। কোনও আলো জ্বালা হয়নি। জিপে তিনজন মানুষ বসে আছে। জিপ ওদের পেরিয়ে চলে যাওয়ার পর, ওরা পিছু নিল বেশ দূরত্ব রেখে। ফরেস্ট অফিসের কাছাকাছি গিয়ে জিপ থামল। তিনটে ছায়ামূর্তিকে জিপ থেকে নামতে দেখল অর্জুন। এই সময় একটা টর্চের আলো এগিয়ে আসছিল ফরেস্ট অফিসের দিক থেকে। চারটে লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল।

অর্জুন নিচু গলায় মেজরকে বলল, "আপনি আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে এখানে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করুন। প্রয়োজনে আপনাকে ডাকব।"

"হোয়াই? আমাকে বসিয়ে দিতে চাইছ কেন? আমি কি মরে গিয়েছি?"

"ছি ছি! আপনি ফোর্ট আগলান। সেটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।"

নিঃশব্দে পদমবাহাদুরকে নিয়ে অর্জুন জিপের কাছাকাছি পৌঁছে গেল জঙ্গলের আড়ালে-আড়ালে। টর্চ হাতের লোকটা লছমন। বাকি দু'জনকে বুঝতে পারল অর্জুন। এদেরই সে দেখেছিল ময়নাগুড়ির ধাবায়, খুঁটিমারি বাংলোয়। চতুর্থজন বিদেশি। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স।

লছমন বলছে, "আমি কথা দিয়েছি, আমি গন্ডারদের ডাকব। কিন্তু তার আগে গিভ মি স্কচ!"

সাহেব বলল, "নো প্রব্লেম। বাট কল রাইনো নাউ।"

"নো স্কচ, নো কল," লছমন মাথা নাড়ল।

বাঙালি লোক দু'টোর একজন সাহেবকে চাপা গলায় কিছু বলতে সাহেব ইশারা করল। দ্বিতীয় লোকটা জিপের পিছনে গিয়ে একটা পিসবোর্ডের বাক্স বের করে মাটিতে রাখল, "এই নাও।"

লছমন এগিয়ে গিয়ে বাক্সের মুখ খুলে একটা বোতল বের করে মুখের সামনে তুলে ভাল করে দেখল। তারপর বোতলটাকে আবার বাক্সের মধ্যে রেখে সেটাকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

সাহেব বলল, "কল দেম।"

লছমন বলল, "ওরা এখন বাংলোর ওপাশে নুন খেতে এসেছে। ওদিকে চলুন।"

চারজন লোক একটু ঘুরে বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সাহেব ইশারা করল ডাকার জন্য। লছমন রেলিংয়ের উপর উঠে মুখের দু'পাশে হাত রেখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলল। অর্জুন আর পদমবাহাদুর ততক্ষণে চলে এসেছে ওদের গাড়ির আড়ালে। অদ্ভুত গলায় আওয়াজ তুলে যাচ্ছে লছমন। হঠাৎ নীচের জঙ্গলে গাছ ভাঙার শব্দ শুরু হল। যেন দুদ্দাড় করে ছুটে আসছে কিছু প্রাণী।

ঠিক তখনই শিলিগুড়ি থেকে আসা মাইকেলের দু'টো লোক চুপচাপ সরে এসে সিঁড়ি বেয়ে বাংলোর উপরে চলে গেল।

হঠাৎ লছমন চেঁচিয়ে উঠল, "দেখুন সাহেব, দেখুন।"

অর্জুন কিছু বোঝার আগেই একরাশ বুনো অন্ধকার যেন ছুটে গেল ওপাশে। ওগুলো যে গন্ডার, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। তারপরই বেশ জোরে ভাঙচুরের শব্দ কানে এল। তখনই উপরের বারান্দায় চলে এসে লোক দু'টোর একজন ইংরেজিতে ঘোষণা করল, "কেউ নেই সাহেব। ওরা পালিয়েছে।"

"কী করে পালাবে? ওরা তো সন্ধের পরে এখানে ফিরে এসেছে। ওই তো ওদের গাড়ি এখানেই পড়ে আছে। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে," সাহেব বলল।

এই সময় সেই পায়ের আওয়াজ আবার ফিরে আসছিল। লছমনকে দৌড়তে দেখে সাহেবও দৌড়ে বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। অর্জুন পদমবাহাদুরকে বলল, "দৌড়োও।" তরতর করে ওরা নেমে গেল নীচে। তারপর একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল, গন্ডারগুলো যেন আছড়ে পড়ল বাংলোর উপর।

ওদিকে তখন রেঞ্জার অফিসের চৌকিদাররা পটকা ফাটাচ্ছে। গন্ডারদের ধাক্কায় বাংলোটা দুলছে। সাহেবের চিৎকার শোনা গেল, "ওদের চলে যেতে বলো, নইলে আমাদের মেরে ফেলবে।"

লছমনের ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা গেল, "আমি ডাকতে জানি, থামাতে জানি না।" বাংলোর সিঁড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার পর গন্ডারগুলো শান্ত হল, কিন্তু জায়গা ছেড়ে গেল না। ঠিক তখনই বাংলোর বারান্দা থেকে মাইকেলের দু'জন লোক গুলি চালাল গন্ডারদের উদ্দেশে। সেটা দেখে খেপে গেল লছমন, "গুলি করছেন কেন? খবরদার, গুলি করবেন না। ওদের গুলি করার কোনও কথা ছিল না।"

"অ্যাই চোপ। তুই নিশ্চয়ই লোক দু'টোকে খবর দিয়েছিস, নইলে ওরা পালাবে কেন? বল, কোথায় রেখেছিস ওদের?"

"আমি কাউকে খবর দিইনি। আমি কথা দিয়েছিলাম গন্ডার দেখাব, দেখিয়ে দিয়েছি," লছমন প্রতিবাদ করল।

দ্বিতীয় লোকটা বলল, "এই ব্যাটা সাহেবটার কী দরকার ছিল গন্ডার দেখতে চাওয়ার। যে কাজে এসেছি তাই চুপচাপ করে চলে যাওয়া উচিত ছিল। যাক, গন্ডারগুলো চলে যাচ্ছে।"

লছমন সেটা দেখে মাথা নাড়ল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, "পালান, পালান এখান থেকে। হাতির দল আসছে।"

দোতলার বারান্দা থেকে লাফিয়ে নামল সে। তারপর চৌ-চৌ দৌড়ল রেঞ্জারের অফিসের দিকে।

প্রথম লোকটা চেঁচাল, "নামুন, গেটডাউন।"

দ্বিতীয় লোকটা উপর থেকে লাফ দিয়েই আর্তনাদ করে উঠল, "মরে গেছি, আমার পা... ওরে বাবা রে।"

প্রথম লোকটা এবং সাহেব লাফিয়ে নীচে নেমে লোকটার কাছে গেল। প্রথম লোকটা তখন যন্ত্রণায় কাতর দ্বিতীয়কে জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই, হাঁটতে পারবি?"

"না, আমার ডান পা একদম গিয়েছে, উঃ," কেঁদে উঠল দ্বিতীয়জন।

প্রথম লোকটা ইতস্তত করছিল। ইংরেজিতে বলল, "হাতি আসছে। এখানে ওকে পেলে মেরে ফেলবে।"

সাহেব বলল, "কোথায় হাতি? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ওই লোকটা আমাদের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে গেল। তুমি যাও, গাড়িটাকে এখানে নিয়ে এসো। না হলে একে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর বেশ ভয়ে-ভয়ে পা বাড়াল।

পদমবাহাদুরকে ইশারা করে অর্জুন উপরে উঠে এল। মাটিতে পড়ে থাকা লোকটা সমানে ককিয়ে যাচ্ছে। সাহেব তাকে চুপ করতে বললেও সে থামছে না। হঠাৎ রেগে গিয়ে সাহেব তাকে লাথি কষাল, তাতে চিৎকার আরও বেড়ে গেল।

অর্জুন সোজা সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, "আমার নাম অর্জুন। তোমার নামটা জানতে পারি?"

চমকে গেল সাহেব, "তুমি কে?"

অর্জুন হাসল, "নামটা শোনবার পরও জিজ্ঞেস করছ? আমি তোমার টার্গেট নম্বর ওয়ান। তোমার নাম কী?"

"কার্ল।"

"বাঃ। কিন্তু কার্ল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। চলো, ওখানে আমাদের গাড়ি আছে, চলো গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসি," অর্জুন বলল।

হঠাৎ পকেটে হাত দিল কার্ল, "চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। মাথার উপর হাত তুলে পিছন ফিরে দাঁড়াও," কার্ল পিস্তল বের করল।

অর্জুন বাধ্য হল আদেশ মান্য করতে। পদমবাহাদুর এগিয়ে আসছিল মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির পাশ দিয়ে। যন্ত্রণায় গোঙাতে-গোঙাতেও লোকটা পদমবাহাদুরের পা ধরে এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে, সে মুখ থুবড়ে পড়ল সামনে। এই সময় জিপের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রথম লোকটা জিপ নিয়ে চলে এল সামনে। অর্জুনকে বেঁধে ফেলতে বেশি দেরি করল না সাহেব। পদমবাহাদুরকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হল বাংলোর ওপাশে। আহত লোকটিকে ওরা সযত্নে তুলে নিল জিপে। কার্ল বলল, "একটু দাঁড়াও।" তারপর ভাঙা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে বাংলোর দোতলায় শরীরটা নিয়ে গেল জিমন্যাস্টের মতো। মিনিটদুয়েকের মধ্যে ফিরে এল লোকটা লুসির ব্যাগ নিয়ে।

অর্জুনকে পিছনে বসিয়ে ওরা জিপে উঠল। কার্ল বলল, "চালাকি আমি পছন্দ করি না। দু'দিন ধরে খুব ভুগিয়েছ আমাদের। প্রাণে বাঁচতে চাও তো চুপচাপ বসে থাকো। আর এই যে, তুমি কি মনে করছ পৃথিবীতে এর আগে কারও পা ভাঙেনি? দয়া করে দাঁতে-দাঁত চেপে সহ্য করো।"

জিপ চলছিল সেই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ প্রথম লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল, "সর্বনাশ। ওটা কী?"

অন্ধকারে সামনের পথ স্পষ্ট না হলেও বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা পড়ে আছে রাস্তা জুড়ে। অত লম্বা কোনও প্রাণী হতে পারে না। প্রাণ থাকলে নড়াচড়া করত। একবার লাইট জ্বালিয়েই নিভিয়ে দিল প্রথমজন। একটা বিশাল গাছ রাস্তা আটকে রেখেছে। প্রথমজন বলল, "ওরকম উদ্ভট শখ কারও হয়? রাতের বেলায় গন্ডারদের ডাকো, দেখবে আর-একটু হলেই ওখানে প্রাণ যেত। আর এখানে ওদের ছুটন্ত

শরীরের ধাক্কায় গাছ পড়েছে। এখন যাব কী করে?"

কার্ল লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। পকেট থেকে টর্চ বের করে রাস্তাটা দেখে এসে বলল, "হয়তো গন্ডাররাই গাছ ফেলেছে। কিন্তু গাছটাকে ওইভাবে রেখে যায়নি।"

"তার মানে?" প্রথম জন খিঁচিয়ে উঠল।

"কোনও মানুষ টেনে নিয়ে গিয়েছে। মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ স্পষ্ট।"

"এখানে মানুষ আসবে? এত রাতে?"

"সেই মোটকা পিপেটা কোথায় গেল, তা কি একবারও ভেবেছ?"

প্রথমজন বলল, "তাই তো।"

"অতএব দয়া করে নেমে এসো।"

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। যেভাবে ওরা ওর হাত-পা বেঁধে রেখেছে, তাতে শোনা ছাড়া কিছু করবার নেই। কিন্তু মেজর অত বড় গাছটাকে টেনে রাস্তা বন্ধ করেছেন, এটা ভাবাই যাচ্ছে না। তা হলে নিশ্চয়ই তিনি আশপাশের জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন।

গাছটাকে সামান্য সরিয়ে গাড়ি চলার উপযোগী করে ওরা ফিরে এল। মিনিটকুড়ির মধ্যে নৌকোর মতো দুলতে-দুলতে জিপ শেষ পর্যন্ত হাইওয়েতে উঠে পড়ল।

প্রথম লোকটা জিজ্ঞেস করল, "ওকে নিয়ে কোন হাসপাতালে যাব?"

"সেটা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জানো," কার্ল জবাব দিল।

মাদারিহাটের মধ্যে দিয়ে জিপ ছুটল। এখন এই মিনি শহরটা গভীর ঘুমে। একটা আলোও জ্বলছে না কোথাও।

ঠিক তখনই অর্জুনের মাথার অস্বস্তি শুরু হল। পকেটে রাখা মোবাইলে আলো দপদপ করছে। ঠিক তারপরেই প্রোফেসর মুলেনের গলা কানে এল, "এখন ইন্ডিয়া টাইম অনুযায়ী তোমার ঘুমোবার কথা। তবু বাধ্য হয়েই তোমাকে জাগাচ্ছি। তুমি মেজরকে বলবে, আগামীকালই কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্কে তোমাদের নিয়ে চলে আসতে। কথাটা লক্ষ করো, তোমাদের বলছি। অর্থাৎ তুমি আর লুসি। ওকে।"

অর্জুন শ্বাস ফেলল। সে এখন কী অবস্থায় আছে, তা জানানো সম্ভব হচ্ছে না। অতএব প্রোফেসর বুঝবেন কী করে, কেন ফেরা যাবে না।

"আমি একটু নীচে নামব," অর্জুন চলন্ত জিপে বসে বলল।

কার্ল জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"প্রকৃতি ডাক দিয়েছে।"

"অ। ওহে, গাড়িটা একটু থামাও।"

গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে প্রথমজন বলল, "ওকে সার্চ করা হয়নি। দেখুন পকেটে কোনও অস্ত্র আছে কি না।"

অর্জুনকে জিপ থেকে নামিয়ে কার্ল অর্জুনের পকেটগুলো হাতড়াতে গিয়ে মোবাইল সেট পেয়ে গেল। অর্জুন বলল, "আমার হাত খুলে না দিলে...।"

কার্ল প্রথম লোকটিকে বলল, "ওকে হেল্প করো। আমি এই যন্ত্রটি দেখছি।"

বোতাম টিপে-টিপে কার্ল রিসিভড কলাম বের করে চেঁচিয়ে উঠল, "মাই গড। ইট মাস্ট বি ওভারসিজ কল, মিনিটদুয়েক আগে এসেছে।"

অর্জুন তখন জলবিয়োগ করছিল প্রথমজন হাত খুলে দেওয়ায়।

"কে ফোন করেছিল?"

"কেউ ফোন করলে তো শুনতেই পেতেন। রিং হত।" কাজ শেষ হতেই অর্জুনের হাত বেঁধে দেওয়া হল।

সঙ্গে-সঙ্গে সজোরে চড় মারল কার্ল। পড়ে যেতে-যেতেও সামলে নিল অর্জুন। কার্ল গজরাল, "আমাকে নির্বোধ ভাবো তুমি? তোমার সন্ধানে কেন এদেশে এসেছি? অ্যাঁ!"

প্রথম লোকটা বলল, "ঠিক আছে। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। এটা হাইওয়ে। পুলিশ এসে পড়তে পারে, উঠুন।" অর্জুনকে উঠিয়ে দিল লোকটা। চোয়াল কনকন করছিল। জিপ চলতেই অর্জুন বলল, "তোমার নাম বলছে তুমি জার্মান। প্রোফেসর মুলেনও তাই। এই একটা জায়গায় মিল দেখছি।"

"মুলেন তোমাকে গিনিপিগ করেছে, তা তুমি জানো?"

"না।"

"ও যে এক্সপেরিমেন্ট করছে, তা শতকরা দু'জন লোকের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ওই টু পার্সেন্টের মধ্যে তুমি আছ।"

"তা হলে হাবুকে খুন করতে গিয়েছিলে কেন?"

"লোকটা বেআদব। ওর মাথার পাশে মোবাইল ফোন রেখে সেই নম্বর ব্যবহার করে দেখতে চেয়েছিলাম ওর মস্তিষ্কে খবর পৌঁছে দেওয়া যায় কিনা! কিন্তু বুদ্ধুটা এমন শক্তি দেখাতে চাইল যে, মেরে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। আশা করি, তুমি ওই ভুল করবে না," কার্ল বলল।

অর্জুন স্বস্তি পেল। যাক, হাবু বেঁচে গিয়েছে, এই তথ্য এদের জানা নেই।

কিন্তু প্রোফেসর মুলেনের গোপন খবর কার্ল জানল কী করে? বিষ্টুসাহেব প্রোফেসরের হয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। মেজর নর্থ বেঙ্গলে আসার সময় বলেছেন, লুসি পাখির ডাক রেকর্ড করতে এসেছেন। সে নিজে মোবাইল নিয়েছে মেজররা এদেশে আসার কয়েকদিন আগে। তার নম্বর পাঠিয়েছে, ব্রেন স্ক্যান এবং পি ই টি রিপোর্ট পাঠিয়েছে। আর আর সেই রিপোর্ট যে প্রোফেসর মুলেনকে মোবাইলের মাধ্যমে তার মস্তিষ্ক কোষে শব্দ পাঠাতে সাহায্য করেছে, এ-কথা কার্ল জানতে পারল কী করে?

হঠাৎ কোমরের কাছে ভিজে-ভিজে অনুভূতি হওয়ায় মুখ ফেরাতেই আহত লোকটাকে দেখতে পেল অর্জুন। ওর আহত পা তার কোমরে ঠেকছে। সে চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বলল। প্রথম লোকটা গাড়ির গতি কমিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আবার কী হল?"

"এই লোকটার শরীর থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। আমার জামা ভিজে গিয়েছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থামাল প্রথম লোকটা। দৌড়ে পিছনে এসে ডাকল, "কী রে? ঠিক আছিস তো? এই সামু...। যাচ্চলে, এ তো কথা বলছে না! শরীর থেকে সব রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে নাকি? এখন কী করা যায়?"

কার্ল বলল, "ফুন্টশোলিং চলো। ওখানে ভাল ডাক্তার নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

"এখনও অনেকটা পথ। তার আগেই তো ও ছবি হয়ে যাবে।"

"গেলে যাবে। টাকা নিয়ে প্রোফেশনাল হয়েছে, অথচ ঠিক মতো লাফাতে জানে না!"

"অ্যাই, ও আমার জিগরি দোস্ত। এসব কথা বলবে না।"

অর্জুন বলল, "কাছেই একটা চা-বাগানের হাসপাতাল আছে। ওখানে নিয়ে গেলে বেঁচে যেতে পারে।"

"আপনি চেনেন?"

"হ্যাঁ।"

"চলুন," লোকটা আবার ড্রাইভিং সিটে ফিরে গেল। অর্জুনের নির্দেশমতো সুভাষিণী চা-বাগানে যখন জিপ ঢুকল তখন অর্জুন বলল, "আমাকে এভাবে দেখলে ওরা আপনাদের প্রশ্ন করবে। কী উত্তর দেবেন?"

লোকটা আবার গাড়ি থামিয়ে পিছনে এসে অর্জুনকে বন্ধনমুক্ত করতে যাচ্ছিল। কিন্তু কার্ল তাকে বাধা দিল, "নো, নেভার। ওকে খুলে দিলে আমাদের বিপদে ফেলবেই। ওর ব্রেন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।"

"কিন্তু আমার বন্ধুর চিকিৎসার জন্য ওর সাহায্য দরকার," প্রথম

লোকটি চেঁচিয়ে বলল।

হাসপাতালের সামনে আলো জ্বলল। ছোট্ট হাসপাতাল। এখন ডাক্তারদের থাকার কথা নয়। নার্স ছিলেন। তাঁকে বলে একটি চৌকিদারকে পাঠানো হল ডাক্তারকে তাঁর কোয়ার্টার্স থেকে ডেকে আনতে। ভদ্রলোক বিছানা ছেড়ে চলেও এলেন খুব তাড়াতাড়ি। এসে সব দেখে বললেন, "এই হাসপাতালে শুধু বাগানের কর্মীদের চিকিৎসা হয়। কিন্তু অর্জুনবাবু, আপনাকে আমি চিনি। আগেও এখানে দেখেছি। তা ছাড়া কেসটা খারাপ দিকে যাচ্ছে, ভর্তি করে নিচ্ছি। তবে কাল জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়িতে নিয়ে যাবেন।" দ্বিতীয় লোকটিকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, "কমপাউন্ড ফ্র্যাকচার। হাড় বেরিয়ে এসেছে। ফলে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। অপারেশন করতে হবে। আমি কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলাম, যাতে ইনফেকশন না হয়। স্যালাইন আর অক্সিজেন চলছে। আপনাদের মধ্যে কারও 'ও' গ্রুপের রক্ত আছে?"

প্রথম লোকটা বলল, "আমার 'ও' গ্রুপ।"

"তাড়াতাড়ি ভিতরে আসুন।"

ওরা ভিতরে চলে গেলে অর্জুন কার্লকে জিজ্ঞেস করল, "কী চাও তুমি?"

কার্ল কাঁধ ঝাঁকাল। উত্তর দিল না।

এই সময় গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা গেল। গাড়িটা অনেকটা কাছে এসে থেমে গেল। তারপর দু'জন লোকের অস্পষ্ট মূর্তি গাড়ি থেকে নামল।

অর্জুন চিৎকার করল, "মেজর, এদিকে আসুন।"

মিনিটখানেকের মধ্যেই পদমবাহাদুরকে নিয়ে মেজর চলে এলেন সামনে, "এই উল্লুকটা, এই উল্লুকটাকে কী করে কব্জা করলে?"

"একে আপনি চেনেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"কস্মিনকালেও নয়। কিন্তু ও তোমাকে বেঁধে এনেছে, তাই তো?"

"কী করে জানলেন?"

"আমি জঙ্গলের আড়াল থেকে দেখলাম। আজ আমি গন্ডারের পায়ের তলায় আর-একটু হলে পড়ে গিয়েছিলাম। পুলিশকে খবর দিয়েছ?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে পিস্তল বের করল কার্ল, "পুলিশ? পুলিশের কথা ভুলে যাও। অর্জুন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।"

"কোথায়?"

"থিম্পু। ক্যাপিটাল অফ ভুটান। কাল দুপুরের ফ্লাইটে দিল্লি থেকে প্রোফেসর মুলেনের প্রধান সহকারী থিম্পু আসছেন।"

"প্রধান সহকারী? তাকে তো দু'মাস আগে তাড়িয়ে দিয়েছেন প্রোফেসর মুলেন? লোকটা ফর্মুলা চুরি করছিল," মেজর বললেন।

এই সময় বাইরে বেরিয়ে এল প্রথম লোকটা, সঙ্গে ডাক্তার, "এঁর জন্যই ওই ভদ্রলোক বেঁচে যাবেন। এত রাতে আপনারা আর কোথায় যাবেন। আমার অফিসঘরে বিশ্রাম করুন। ম্যানেজার এখন বাগানে নেই। অর্জুনবাবু, ঘটনাটা আপনি আগামীকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে বলে যাবেন। আর হ্যাঁ, কালই ওকে অপারেশনের জন্য নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু...।"

"কোনও সমস্যা?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"এরকম কেস হাসপাতালে এলে পুলিশকে জানানো নিয়ম।"

"আমরা কোনও পুলিশ চাই না ডাক্তার। ভোর হলেই যদি সমস্যা হয়, তা হলে এখনই ওকে শহরে নিয়ে যেতে পারি," প্রথমজন বলল।

"অসম্ভব। এখন ওকে মুভ করানো যাবে না। সেটল হতে সময় দিতে হবে। তা ছাড়া নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স চাই। বীরপাড়া থেকে আনাতে হবে। এই ভদ্রলোকের হাতে পিস্তল কেন?" ডাক্তার অবাক হলেন।

প্রথমজন বলল, "ওটা পকেটে রেখে দিন সাহেব।"

কার্ল যন্ত্রটা পকেটে রাখল। প্রথমজন বলল, "বিদেশি তো, সব সময় বন্য জন্তুর ভয় পায়। ঠিক আছে, আপনি যান, বিশ্রাম নিন।"

ডাক্তার চলে গেলে কার্ল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাল চলে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"মাইকেল কথা দিয়েছিল কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে।"

"ঠিক। কিন্তু আমার বন্ধুর প্রাণ বাঁচানো অনেক জরুরি।"

"এটা কিন্তু চুক্তিভঙ্গ হচ্ছে।"

"আই অ্যাম সরি সাহেব।"

"বেশ। অর্জুনকে বেঁধে জিপে তুলে দাও। আমিই ওকে ফুন্টশোলিংয়ে নিয়ে যাব। ওখান থেকে লোক জোগাড় করে থিম্পু যেতে অসুবিধে হবে না।"

অর্জুন হাসল, "তোমার বুদ্ধি দেখে হাসি পাচ্ছে আমার। উনি আমাকে বাঁধতে আসবেন আর আমি এখন এখানে সেটা করতে দেব? তখন আমি প্রায় একা ছিলাম। তুমি পিস্তল দেখিয়েছিলে, তাই মানতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন ওই চেষ্টা করতে গেলে ওকেও বন্ধুর পাশের বেডে গিয়ে শুতে হবে।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ আমার পকেটে পিস্তল আছে।"

"জানি। একটা গুলির আওয়াজ হলে শ'য়ে-শ'য়ে শ্রমিক ছুটে আসবে। তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। ছুড়ে দ্যাখো," অর্জুন হাসল।

হঠাৎ অসহায়ের মতো দু'হাতে পিস্তল তুলে মুঠোয় ধরল কার্ল, "ওঃ! আই অ্যাম সো হেল্পলেস।" তারপর চোখ বন্ধ করে একটু ভাবল লোকটা। শেষে চোখ খুলল, "অর্জুন, আমার নাম কার্ল। আমি দিল্লিতে থাকি। আমি গুন্ডা-বদমাশ নই। এই মোটকুরা যেদিন বাগডোগরায় নেমেছে, তার আগের দিন ওই একই ফ্লাইটে আমি এসেছি। দিল্লি থেকেই মাইকেলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল একজন। মাইকেল এই দু'টো লোককে দিয়েছিল আমাকে সাহায্য করার জন্য। প্রোফেসর মুলেন যেমন মানুষের ব্রেন নিয়ে রিসার্চ করছেন, তেমনই ওঁর প্রধান সহকারী প্রোফেসর বেকারও একই কাজ করছেন। আমি ব্যবসার কাজে দিল্লিতে আছি। প্রোফেসর বেকার আমার আত্মীয়। উনি জানতে পেরেছেন প্রোফেসর মুলেন তোমার ব্রেন সেলে কথা পৌঁছতে পেরেছেন। অথচ সবার ব্রেনে এটা করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং গবেষকদের কাছে তোমার চাহিদা আছে। তুমি যদি কাল আমার সঙ্গে থিম্পুতে গিয়ে প্রোফেসর বেকারকে তোমাকে নিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ দাও, তা হলে খুশি হব।"

"অসম্ভব," মেজর খেপে গেলেন, "এক কোটি ডলার দিলেও তোমরা অর্জুনকে কিনতে পারবে না। প্রোফেসর মুলেন বিষ্টুসাহেবের বন্ধু। তাই আমি বা অর্জুন তার সঙ্গেই থাকব। অর্জুন, এই হনুমানটাকে পুলিশের হাতে তুলে দাও।"

"ওঃ, আবার পুলিশ! অর্জুন, তুমি যাবে না?"

অর্জুন হাসল। কথা বলল না।

"কত টাকা পেলে তুমি যেতে পারবে?"

"আপাতত আমার টাকার খুব বেশি দরকার নেই কার্ল!"

"অ," থিতিয়ে গেল কার্ল। তারপর বলল, "বেশ যেতে হবে না, কিন্তু তুমি আমাকে আধঘন্টা সময় দেবে?"

"বেশ।"

"তা হলে চলো। শুধু তুমি আমার সঙ্গে যাবে।"

"তা হয় না। মেজর আমার সঙ্গে যাবেন।"

"এখানকার গেস্টহাউজটা কোথায়?"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। কার্ল এই বাগানের গেস্টহাউজের কথা জানল কী করে? সে জিজ্ঞেস করল, "আজ সন্ধের পর তুমি কি গেস্টহাউজে এসেছ?"

"না। এলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না," কার্ল হাসল, "কিন্তু আমি জানি লুসি আছে ওখানে। চলো।"

"লুসিকে খুন করলে বা জ্যান্ত ধরে দিলে টাকা দেবে, একথা প্রচার করেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কেউ যদি খুন করে ফেলত?"

"পারত না।"

"তোমরাই তো লুসির ঘর ভুল করে সাপ ফেলেছিলে।"

"না, আমরা জানতাম লুসি ও ঘরে নেই, ওই মোটকুটা আছে। ও মুলেনের চামচে। তাই একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।"

"কী?" মেজর চেঁচালেন, "আমাকে শিক্ষা দেবে? সাপটা যদি আমাকে কামড়াত তা হলে? তা হলে কী হত?"

অর্জুন ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথম লোকটাকে বলল, "আপনি এখনই বীরপাড়ায় চলে যান জিপ নিয়ে। ভোর হতে দেরি নেই। ওখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসুন। চলুন মেজর।"

গেস্টহাউজের গেট খুলতেই বাধা পেল ওরা। প্রহরীরা বলল, "ভিতরে যাওয়ার হুকুম নেই।" কিন্তু তাদের একজন অর্জুনকে চিনতে পারল। লোকটা বলল, "মেমসাহেব বাংলো থেকে বেরোতে চেয়েছিলেন, আমরা যেতে দিইনি।"

"ভাল করেছ। ওর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।"

উপরে উঠে গেস্টরুমে ওরা বসতেই মেজর গিয়ে দরজায় শব্দ করলেন, "লুসি, মাই লিটল সিস্টার, তুমি কি জেগে আছ?"

দরজা খুললেন লুসি। বোঝা গেল তিনি ঘুমোননি। সবাইকে ভাল করে দেখলেন। কার্ল এগিয়ে গেল, "আমি কার্ল।"

"আমি লুসি।"

"এভাবে কথা হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে।"

"ঠিক আছে, এরা কি সব জেনে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ। না জানিয়ে উপায় ছিল না। আমার লোক দু'টোর জন্য সব বিগড়ে গেল। আমি তোমার সঙ্গে ভিতরে গিয়ে কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

কার্ল ভিতরে চলে গেল দরজা ভেজিয়ে। মেজর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, "একী! লুসি যে ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে। বেচারা জানে না, এই লোকটা প্রোফেসর মুলেনের শত্রু।"

"আমার মনে হয় উনি জানেন," অর্জুন বলল।

"জানে? আমরা একসঙ্গে প্লেনে এলাম। ও তো প্রোফেসর বলতে অজ্ঞান।"

"অপেক্ষা করে দেখুন।"

খানিক বাদে কার্ল দরজা খুলে অর্জুনের সামনে এল, "আমাদের কাছে কোনও যন্ত্রপাতি নেই। তবু একটা এক্সপেরিমেন্ট করবে লুসি। তোমার মোবাইল অন আছে কি?"

"হ্যাঁ।"

"ওটা কানের উপর রাখো।"

অর্জুন মোবাইলটা পকেট থেকে বের করতেই রিং হল সশব্দে। কার্ল বলল, "এবার কানে চেপে ধরো। হ্যাঁ, আগে রিসিভ করো।"

অর্জুন বোতাম টিপে কানের কাছে মোবাইল নিয়ে গেল। কোনও শব্দ নেই। তারপর হঠাৎ বিপবিপ বিপ শব্দ এবং তারপর হুইসলের আওয়াজ হয়ে মিলিয়ে গিয়ে পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। হঠাৎ মাথার ভিতর প্রবল অস্বস্তি। অস্বস্তিটা বাড়ছে কিন্তু কোনও গলা শুনতে পাচ্ছে না অর্জুন। ঠিক সেই প্রাইভেট নম্বর থেকে ফোন এলে এই বিপ বিপ শব্দে এইরকম অস্বস্তি হয়ে থাকে। সে মোবাইল সরিয়ে নিতে কার্ল প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার মাথায় কি কোনও অনুভূতি হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। অস্বস্তি হতে-হতে ফাঁকা হয়ে গেল মাথার ভিতরটা।"

অর্জুন বলামাত্র কার্ল চিৎকার করে উঠল, "লুসি, ট্রুলি ইট্স ওয়ার্কিং।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কী হচ্ছে?"

লুসি বেরিয়ে এলেন বাইরে, "প্রোফেসর মুলেনের থিওরি হল পাখিদের শ্রবণশক্তি খুব বেশি। বিশেষ করে বিপবিপ বিপ ডাকটা যে পাখি ডাকে, ওদের কানে শব্দটা পৌঁছে দিলেই ওরা ডেকে উঠবে। আর এই সিগনালটা ছড়িয়ে যাবে অনেক দূরে। নাউ, অর্জুন, অন বিহাফ অফ প্রোফেসর বেকার, তোমাকে এক লক্ষ ডলার অফার করছি। তোমার ব্রেনের স্ক্যান রিপোর্টের কপি আমার কাছে আছে। কিন্তু পি ই টি রিপোর্ট পাইনি। তা ছাড়া তোমার ব্রেন কেন সিগনাল অ্যাকসেপ্ট করছে, এটা জানা দরকার। তুমি কি আগামীকাল থিম্পু যাবে?"

"সরি লুসি," অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আমার মগজ আমি আপনাদের গবেষণার জন্যে দিতে রাজি নই। চলুন মেজর।"

ওরা নীচে নেমে আসতেই দেখল দু'টো পুলিশের জিপ বাংলোয় ঢুকছে। ডাক্তারবাবু ছুটে এলেন, "কিছু হয়নি তো আপনার? লোকটার হাতে পিস্তল দেখে আমি থানায় খবর দিলাম। ইনি ওসি, মিস্টার সেন, ইনি অর্জুন।"

মিস্টার সেন জিজ্ঞেস করলেন, "শুনলাম, একজন বিদেশি পিস্তল দেখিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। গত রাতে জলপাইগুড়ির একটি নিরীহ মানুষকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। আজ হলং বাংলো ওর জন্যই প্রায় চুরমার হয়েছে। দু'টো পেশাদার লোককে ভাড়া করে এনেছিল আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য," অর্জুন বলল।

"আর লুসি, লুসির কথা বলো।"

"না মেজর, লুসির বিরুদ্ধে কোনও চার্জ আনা যাবে না," অর্জুন বলল," হ্যাঁ, ওই লোকটি এখানকার ট্রানজিট থেকে সাপ চুরি করে এই ভদ্রলোককে মারবার চেষ্টা করেছিল।" অর্জুনের কথা শেষ হতেই পুলিশবাহিনী উপরে উঠে গেল।

কী মনে হতে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে অর্জুন বলল, "এটা সহ্য হচ্ছে না আমার। কী করা যায় এটাকে নিয়ে?"

পদমবাহাদুর এগিয়ে এল সামনে, "আমাকে দেবেন সাব?"

অর্জুন হেসে ওর হাতে মোবাইলটা দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই। তুমি জানো না, আমার কী উপকার করলে!"